শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলার

গুপ্ত রহস্য।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীমন্মথনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৮।

মূল্য ৷৹ আট আনা।

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ।

গুরুদেব!

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যলীলার গুপ্তরহস্য তোমারই চরণোদ্ভূত ও তোমারই চারু চরণাশ্রিত। তাই আজ তোমার সামগ্রী তোমারই শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

ভূমিকা।

প্রায় সকল শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় মহাপ্রভু (শ্রীচৈতন্য দেব) ভক্তাবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া কলির দুর্ব্বল এবং ধর্ম্ম হীন জীবের কল্যাণের জন্য সর্ব্ব-শাস্ত্রানুমোদিত যুগ ধর্ম্ম অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কলির স্বেচ্ছাচারী জীবের পক্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কঠোরতম অনুশাসন পালন করা অনায়াসসাধ্য নহে, তাই মহাপ্রভু বেদাদি শাস্ত্রার্ণবের নিগূঢ় গর্ভ মন্থন পূর্ব্বক ভারতকে উচ্চৈঃ-স্বরে আশ্বাস দিয়াছিলেন "ভয় নাই" কলির সমস্ত দোষ থাকিলেও ইহার একটি বিশেষ গুণ আছে। সমস্ত ধর্ম্ম পালন করিতে পার আর নাই পার হরিনাম করিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে ভববন্ধন মোচন এবং পরম পদ লাভ হইবে কিন্তু বহুকাল হইতে দাসত্ব-লব্ধ অন্ন ভোজন করিয়া হিন্দুর কোমল হৃদয় এরূপ বিশুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে যে, এমন সহজ উপায় থাকিতেও কেহ বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন না। ইহা কেবল কালের দোষ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে। মহাপ্রভু শ্রীরূপ সনাতনকে যে সকল ভক্তিতত্ত্ব এবং যোগতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার রহস্য অতীব গুহ্য। বৈষ্ণব ধর্ম্মের বেদ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পয়ারের ছন্দে লিখিত থাকায় তাহার অর্থ বড়ই দুরূহ, সাধারণ লোকে

পয়ারের গুপ্ত অর্থ বুঝিতে পারে না, তাই ঐ সকল রহস্য চিরদিন গুপ্ত ভাবেই আছে এবং সেই জন্যই সর্ব্ব সাধারণ জনগণের পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থা হয় নাই। আমরা যতদুর সাধ্য ঐ সকল গুহ্যতত্ত্বের অর্থ ব্যাখ্যা করিলাম। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম উদ্দীপিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ভারতের ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গলের জন্যই মহাপ্রভু বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা শাস্ত্র বচন দ্বারায় প্রমাণ করিয়াছি। এক্ষণে আধুনিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভণ্ডামী ত্যাগ করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসী মাত্রেই যদি এই পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন তবে আবার ভারতের মুখোজ্জ্বল হইবে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইতি।

বর্দ্ধমান।
তারিখ ৫ই পৌষ, ১২৯৮।

গুরুকৃষ্ণ দাসানুদাস
শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলার

গুপ্তরহস্য।

"গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে।
কলিপাপ বিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনি।
জনিষ্যামি প্রিয়ে মিশ্র পুরন্দর গৃহে স্বয়ং।
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ॥"

প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইল নবদ্বীপ আলোকিত করিয়া শ্রীমচ্চৈতন্য দেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কেন? হরিনামামৃত পান করাইয়া জগৎকে মাতোয়ারা করিয়াছিলেন কেন? তাঁহার প্রেমাশ্রুবিন্দুতে এখনও দেশ ভাসিতেছে কেন? ব্রাহ্মণ হইতে যবন পর্য্যন্ত জাতি বিচার না করিয়া সকলকেই সেই এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন কেন? অনেকেই অদ্যাপি তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। অনেক মহাত্মা বলেন যে চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ক্ষতি করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কত লোক অনধিকারে বর্ণধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া স্বেচ্ছাচারের দাসত্ব করিতেছে। কিন্তু আমরা বলি, যে মহাত্মারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। কেননা একালে চারিটি বর্ণ কৈ? এবং

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বা কৈ? যে দিন হইতে ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়াছে, যেদিন হইতে আর্য্য-দিগের রাজলক্ষ্মী চিরদিনের মত বিদায় লইয়াছেন, যেদিন হইতে ক্ষত্রিয়কুল বীর্য্যহীন হইয়াছেন, এবং যেদিন হইতে যবন-দাসত্ব লব্ধ অন্ন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজঃ বিধ্বস্ত করিয়াছে; সেই দিন হইতেই বর্ণ এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে; কেবল আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক শব্দটি মাত্র আছে। মহাভারতের 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কথন" পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় সেকালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং তাহাদের আশ্রমধর্ম্ম একালে আর নাই। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যেঃ—

ভৃগুরুবাচ। ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তেদ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃকৃষ্যুপ জীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তেদ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ।
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।
ইত্যে তৈঃ কর্ম্মাভির্ব্যস্তা দ্বিজাবর্ণান্তরং গতাঃ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—ভৃগু কহিলেন, বর্ণ সকলের বিশেষ নাই, এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রথম সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কর্ম্মানুসারে বিবিধ বর্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণগন কামভোগে অনুরক্ত, তীক্ষ্ণ স্বভাব,

ক্রোধন, সাহসিক, স্বধর্ম্মত্যাগী ও লোহিতাঙ্গ, তাহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আর যাহারা গো সমুদায় হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করতঃ কৃষিজীবী হইয়াছে এবং স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, সেই পীতবর্ণ ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যত্ব লাভ করিয়াছে। যে সমস্ত দ্বিজগণ হিংসা ও মিথ্যারত, সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবী কৃষ্ণবর্ণ এবং শৌচপরিভ্রষ্ট তাহারাই শূদ্র হইয়াছে। এই সমস্ত কর্ম্মদ্বারা পৃথক্‌কৃত ব্রাহ্মণেরাই বর্ণান্তরে গমন করিয়াছে।

ভরদ্বাজউবাচ। ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা দ্বিজোত্তম।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ্ব্রূহি বদতাং বর॥

ভৃগুরুবাচ। জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন-সম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ।
শৌচাচার স্থিতঃ সম্যগ্বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ সবৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
সত্যংদানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপাঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতিস্মৃতঃ।
ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়ন সঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্তু সবৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে।
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ সবৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ।
সর্ব্বভক্ষরতি র্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ সবৈ শূদ্রইতি স্মৃতঃ।
শূদ্রেচৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজেতচ্চ নবিদ্যতে।
নবৈ শূদ্রোভবেচ্ছূদ্রোব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণোনচ॥

অস্যার্থঃ। ভরদ্বাজ বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম বক্তৃবর বিপ্রর্ষে? কোন্ কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়? কি করিলে ক্ষত্রিয় হইয়া থাকে এবং কিরূপ কার্য্য দ্বারা বৈশ্য ও শূদ্র হয় আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন্।

ভৃগু কহিলেন, জাত-কর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা যিনি সংস্কৃত ও শুচি হইয়াছেন এবং যিনি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রতিদিন যিনি সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা, আতিথ্য ও বলিবৈশ্বদেব এই ষট্ কর্ম্ম করিয়া থাকেন; শৌচ ও আচার সমন্বিত সম্যক্‌রূপে বিঘসাশী ও গুরুজনের প্রিয় পাত্র, নিত্যব্রতী এবং সত্যপরায়ণ, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। যাঁহাতে সত্য, দান, অদ্রোহ, আনৃশংস্য, দয়া, লজ্জা, ও তপস্যা আছে তিনিই ব্রাহ্মণ হয়েন। যিনি যুদ্ধাদি হিংসা কার্য্য করিয়া থাকেন, বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হয়েন এবং ব্রাহ্মণগণকে অর্থদান ও প্রজাগণ হইতে অর্থ আদান করেন তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা যায়। যিনি কৃষি ও পশুপালন করেন, দান করিতে অনুরক্ত রহেন, শুচি ও বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন তিনিই বৈশ্যসংজ্ঞক হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিয়ত সমস্ত বস্তু ভক্ষণেই অনুরক্ত, সমস্ত কর্ম্ম করিতে আসক্ত, অশুচি, বেদজ্ঞানবিহীন ও অনাচার, তাহাকেই শূদ্র বলা যায়। ব্রাহ্মণের লক্ষণ যদি শূদ্রে লক্ষিত হয় তবে তাদৃশ শূদ্রও শূদ্র নহে এবং ব্রাহ্মণে যদি তদীয় লক্ষণ না থাকে, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না।

এইরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের লক্ষণ মহাভারতে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সম্যক্ উদ্ধৃত করা অসম্ভব

তবে "বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকথন" পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা ক্ষাত্রধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, রাজধর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষাত্রধর্ম্ম দ্বারাই সকল বর্ণই রক্ষিত হয়। সুতরাং ক্ষাত্রধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে সকল ধর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ ব্রাহ্মণগণ ক্ষাত্রধর্ম্ম দ্বারাই পরিরক্ষিত হন, কারণ ব্রাহ্মণ বিনষ্ট হইলে চাতুর্ব্বর্ণ্য অথবা চাতুরাশ্রম্য প্রভৃতি কোন ধর্ম্মই থাকিতে পারে না।

এখন আমরা বুঝিলাম যে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিরক্ষিত হইবে। কিন্তু হায়! আজ সেই বীরেন্দ্রকেশরিগণ কোথায়? ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করতঃ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই ত্রিবর্ণকে যথোক্ত আশ্রম ধর্ম্ম সকল, কে আচরণ করাইবে? আজ কাহার বাহুবলে এই সকল ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে? ইদানীং সেই ক্ষত্রিয়কুল ত নির্ম্মূল হইয়াছে তবে আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৈ? আবার এই ঘোর দুর্দ্দিনে সেই সনাতন-ধর্ম্ম-স্তম্ভ ব্রাহ্মণগণ কোথায়? চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণুতত্ত্ব আর কে বুঝিবে? ধর্ম্মময় সূক্ষ্মদর্শনে অতীন্দ্রিয় পদার্থের উপলব্ধি কে করিবে? এই বর্ণসঙ্কর বিধর্ম্মি বিপ্লাবিত দেশে অনাচার, অত্যাচার, ব্যভিচার ও ম্লেচ্ছাচারসঙ্কুল কলিকালে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ক্ষেত্রে যজ্ঞব্রত সম্পাদন কে করিবে? আর কি সেই ভারতবর্ষ হইতে স্রোতস্বিনী নদীর ন্যায় পয়স্বিনী গাভীগণের দুগ্ধস্রোতঃ প্রবাহিত হইবে? আর কি ঋষিগণের প্রার্থনানুসারে বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠশূন্য করিয়া যজ্ঞরক্ষার্থ ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন? আর কি যজ্ঞাগ্নি হইতে শুকদেবের মত তত্ত্বজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করিবেন? ভারত

আজ সে তপোবল বিক্রম হারাইয়াছে। আর সে বিশ্বাস নাই, বল নাই, ধৈর্য্য নাই, সাহস নাই, তাদৃক তপোবল-সম্পন্ন ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ নাই; যে ব্রাহ্মণ সুরত্ব, ইন্দ্রত্ব এবং ব্রহ্মপদ পর্য্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করতঃ চিরজীবন কেবল তপস্যা করিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন, আজ সে ব্রাহ্মণ আর নাই, যে ব্রাহ্মণের কঠোর তপস্যার ইতিহাস শুনিয়া আজ উপন্যাস বলিয়া মনে হয় সে ব্রাহ্মণ আর নাই। গর্ভা-ধান হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশান-কার্য্য পর্য্যন্ত জীবনের সমস্ত ব্যাপার বেদমন্ত্রে সমাহিত হইত সে আর্য্যজীবন আর নাই। সে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী পিতা মাতা আর নাই। পরব্রহ্ম সমাহিত নির্ব্বিকল্প হৃদয়ে কেবল দৈবতেজঃ সম্পন্ন পুত্র কামনায় ঋতুকালে একবারের জন্য ধর্ম্ম পত্নীতে উপগমন আর নাই। তবে আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কে রক্ষা করিবেন? হায়! আজ সেই ত্যাগশীল ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের বংশধরগণ বেদাধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজ্ঞাদি করা দূরে থাকুক্, সন্ধ্যা, জপ, হোম ও পূজা করা দূরে থাকুক্, অর্থলালসায় অধম জাতির শুশ্রূষণ এমন কি দাসত্ব পর্য্যন্ত করিতেছেন, স্বধর্ম্ম-ত্যাগী ও আচারভ্রষ্ট হইয়া (ব্রাহ্মণ বলা দূরে থাক্) হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন কি না সন্দেহ। আর যাঁহারা শাস্ত্রা-ধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনা করিয়া থাকেন তাঁহারা দগ্ধ উদরের জন্য না করেন এমন অকার্য্যই নাই, অর্থ পাইলে মিথ্যা ব্যবস্থা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ধর্ম্মচিন্তা আর নাই, এখন কেবল অন্ন-চিন্তাই তপস্যা। আবার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ কুলীন উপাধিধারী মহাশয়েদের

অনাচার, ব্যভিচার, কদাচার ও পাপাচারের কথা লিখিয়া আমরা লেখনীকে কলুষিত করিতে চাই না, তবে তাঁহারা কোন্ সাহসে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন ইহাই আশ্চর্য্য। গর্ভাধান হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি বলিয়া শুনিতে পাই, কিন্তু হিন্দু সমাজের চূড়ামণি মহাশয়দের কন্যার বিবাহের সময় কোন শাস্ত্রই খাটে না। কুলীন কন্যার ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃ-ক্রম হইলেও বিবাহ হয় না। আবার একজন কুলীন শতাধিক কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেও জাতি বা ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় না। (আমরা দেখিয়াছি একরাত্রে এক অতি বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ ১৩টি হতভাগিনী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া-ছেন) বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু এই সকল কন্যার সতীত্ব রক্ষা কে করিবে? তাহাদের মতি গতি কি হইবে? তাহাদের চিরদুঃখ নিবারণের উপায় কি? তাহাদের ব্যভিচারেই ত আজ ভারত রসাতলে গিয়াছে। দুঃখের কথা বলিব কি, তাহাদের ব্যভিচারের কথা শুনিয়া আজ ম্লেচ্ছ জাতিও কর্ণে অঙ্গুলি দিতেছেন। ব্রাহ্মণ একটির অধিক কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন এরূপ বিধি কোন্ শাস্ত্রে আছে? আর্য্যদিগের প্রণীত শাস্ত্রে তো কখনই থাকিবে না; আবার কোন যুক্তিতেও ত আইসে না। তাই আজ বিধর্ম্মিগণ হিন্দুধর্ম্মকে ভণ্ডামীতে পরিপূর্ণ বলিয়া উপহাস করেন, কিন্তু তাহাদের কথায় কোন্ হিন্দু প্রতিবাদ করিবেন? এখন আর হিন্দুর ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি নাই, আজ হিন্দুর যথা কথঞ্চিৎ উদর পূর্ত্তি হইলেই আনন্দ। আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই (যাঁহারা ইংরাজী ভাষা

কখনও অধ্যয়ন করেন নাই) বাজারের যবন-স্পৃষ্ট, পক্কান্ন, কলের চিনি, লুচি, আলুরদম, গো এবং শূকরের চর্ব্বি মিশ্রিত ঘৃত, কলের ময়দা ও লবণ সিদ্ধ তণ্ডুল, এবং বাজারের হোটেলের অন্ন প্রায় সকল, ব্রাহ্মণ মহাশয়ই অম্লান বদনে ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। ইহাতে ব্রাহ্মণত্ব, হিন্দুত্ব রক্ষা হওয়া দূরে থাক্, যবনত্ব পর্য্যন্ত কখনই রক্ষিত হইতে পারে না। আবার যাঁহারা যবনান্ন ভোজন করতঃ হতভাগ্য হিন্দু সমাজকে পদদলিত করিতেছেন তাঁহাদের বাটীতে এমন কি বেশ্যা বাটীতেও কোন তামসিক প্রতিমা পূজা কিংবা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কলাপ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণগণ এবং উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভোজন করিতেছেন, চাঁদা লইতেছেন, দক্ষিণা লইতেছেন এবং বিদায় লইয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছেন। আবার চারিদিকে চীৎকার করিতেছেন "কলিতে ব্রাহ্মণ আছেন বৈ কি?" বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম "হিন্দুধর্ম্ম" আছে বৈ কি? কিন্তু আমরা বলিতে পারি কলিতে ব্রাহ্মণ নাই, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাই, এবং হিন্দুধর্ম্মও নাই। কলিতে ব্রাহ্মণ নাই তাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও নাই। এদিকে কত শত মহাপুরুষ আমোদের জন্য চিরকাল অখাদ্য ভোজন করিয়াছেন, অবশেষে রোগ প্রযুক্তই হউক অথবা পারত্রিক দণ্ডের লঘুকরণ জন্যই হউক, অখাদ্য ভোজন পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া আজ হিন্দু সমাজে পসার করিতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি (হিন্দুধর্ম্ম আজকাল তো লাওয়ারিস্ হইয়া পড়িয়াছে)। যদি এক দেহেতেই অখাদ্য ভোজন করিয়া অবশেষে কোন

কারণ বশতঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দু হইতে পারা যায়, তবে সেকালে যাঁহারা সামান্ত ব্রাণার্দ্ধ-ভোজন-পাপে পিরিলি হইয়াছিলেন তাঁহাদের অপরাধ কি? এবং যাঁহারা বিদ্যা শিক্ষার্থ বিলাত গিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বা অপরাধ কি? মহাভারতে স্বধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণকে শূদ্র সদৃশ বলিয়াছেন, যথা—

জ্যাকর্ষণং শত্রুনিবর্হণঞ্চ কৃষির্বণিজ্যা পশুপালনঞ্চ।
শুশ্রূষণঞ্চাপিতথার্থ হেতোর কার্য্যমেতৎ পরমং দ্বিজস্য।
সেব্যন্তু ব্রহ্মষট্ কর্ম্ম গৃহস্থেন মনীষিণা।
কৃত কৃত্য স্যচারণ্যে বাসো বিপ্রস্য শস্যতে।
রাজ প্রেষ্যং কৃষিধনং জীবনঞ্চ বণিজ্যয়া।
কৌটিল্যং কৌলটেয়ঞ্চ কুষীদঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
শূদ্রো রাজন্ ভবতি ব্রহ্মবন্ধু র্দুশ্চারিত্রো
যশ্চধর্ম্মাদপেতঃ।

বৃষলীপতিঃ পিশুনো নর্ত্তনশ্চ গ্রাম প্রেষ্যো যশ্চ
ভবে দ্বিকর্ম্মা।

জপন্ বেদানজপংশ্চাপি রাজন্ সমঃ শূদ্রৈর্দাসবচ্চাপি
ভোজ্যঃ।

এতেসর্ব্বেশূদ্রসমাভবন্তি রাজন্নেতান্ বর্জ্জয়েদ্দেবকৃত্যে।
নির্মর্য্যাদে চা শুচৌ ক্রূরবৃত্তৌ হিংসাত্মকে ত্যক্তধর্ম্ম—
স্ববৃত্তে।

হব্যং কব্যং যানি চান্যানিরাজন্ দেয়ান্য দেয়ানি
ভবন্তি চাস্মৈ॥

অস্যার্থ। জ্যাকর্ষণ, শত্রুনিহনন, কৃষি, বাণিজ্য, পশু-পালন এবং অর্থলাভ লালসায় অন্যের শুশ্রূষণ এই সমস্ত ব্রাহ্মণের অকার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধিমান্ গৃহস্থের ব্রহ্মবিষয়ক ষট্ কর্ম্ম সকল আচরণপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করাই প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ রাজার (তখন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন) দাসত্ব, কৃষিলব্ধধন, বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, কৌটিল্য, কৌলটেয় অর্থাৎ পরদার-রতি এবং কুসীদ ঋণ দান বা তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদগ্রহণ এই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন। মহারাজ ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ অধম ব্রাহ্মণ এবং দুশ্চরিত্র,স্বধর্ম্মপরিত্যাগী বৃষলীপতি, পিশুন, নর্ত্তন, গ্রামপ্রেষ্য, কুকর্ম্মরত ব্রাহ্মণ শূদ্র সদৃশ, সুতরাং সে বেদোক্ত মন্ত্র সকল জপ করুক বা না করুক, দাসগণের শূদ্র পঁক্তিতে ভোজনীয় হইয়া থাকে। মহারাজ রাজ প্রেষ্যাদি সকলেই শূদ্র-সদৃশ, অতএব তাহাদিগকে দেবকৃত্যে বর্জ্জন করিবে। ব্রাহ্মণ মর্য্যাদা বিহীন, অশুচি, ক্রূরবৃত্তি, হিংসক এবং স্বীয় ধর্ম্ম ও বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে, তাহাকে হব্য কব্য প্রভৃতি যাহা কিছু দেওয়া যায়, সমস্তই অদত্তের ন্যায় হইয়া থাকে।

এখন পাঠক মহোদয়গণ বিচার করিয়া দেখুন, মহাভারতোক্ত সেই বেদজ্ঞ, আচারবান্ শুক্লবর্ণ ব্রাহ্মণ একালে আর কৈ? সেই পিঙ্গলবর্ণ ক্ষত্রিয় কৈ? সেই পীতবর্ণ বৈশ্য কৈ? এখন আমরা বলিতে পারি যে "শুক্লোরক্তস্তথা-পীতশ্চ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"। আজকাল সকল বর্ণই কর্ম্ম দোষে শূদ্রবর্ণ হইয়াছে। তাই ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত

আজ বাবু উপাধিধারী * হইয়াছে। তবে আর বর্ণ কৈ? বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বা কৈ? আর্য্যধর্ম্ম আর নাই আছে কেবল বাহ্যাড়ম্বর আর ঘোর ভণ্ডামি।

(৪) বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর এবং ভণ্ডামি দেখিয়াই তো কত সহস্র লোক মুসলমানদের শাসন সময়ে মুস্‌লেম্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, আবার ইংরেজের শাসন-সময়ে কত সহস্রলোক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল, পাদরি ভায়াদের মিষ্টভাষণে কতলোক চমকিত হইলেন। এমন সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় ভাবিলেন হিন্দুধর্ম্ম আর থাকে না, এমন কোন উপায় অবলম্বন করা চাই যাহাতে লোকে আর খৃষ্টীয়ান হইতে না পারে, তাই 'তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিবার আবশ্যকতা নাই, কেবল ঈশ্বর উপাসনা করিলেই জীবের মুক্তি হইবে এই জন্যই তিনি সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনা করিয়াছিলেন। সে সময়ে যদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত না হইত তবে আজ খ্রীষ্টিয়ান হইতে কেহ বাকী থাকিত না। সে সময়ে ভারতের যে সংক্রামক পীড়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে ব্রাহ্মসমাজই তাহার মহৌষধ হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে। তবে তিনি বড়ই সূক্ষ্ম পথ দেখাইয়াছিলেন, তাই আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজের কোন উন্নতি হইল না বরং ভ্রাতাদের অত্যাচারে আজ সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছে। তাহা-

---

* পূর্ব্বে যে কারণে মুসলমানরাজ আর্য্যদিগকে কাফের বলিতেন আজ সেই কারণেই বোধ হয় ইংরাজ হিন্দুকে বাবু বলিয়া সম্বোধন করেন।

দের ধর্ম্মালোচনাত কখনই নাই কেবল ভারত উদ্ধার হইবে কিসে এই চিন্তা, আবার মধ্যে মধ্যে গির্জ্জায় গিয়া সমস্বরে নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, নিগুর্ণ ব্রহ্মবেচারির উপর হুকুম জারি করিয়া থাকেন "অন্ধকার হইতে তে আলোতে তে লইয়া যাও"। বিধবা দিদিবাবু, পিসিমা,, মাসিমা এবং দিদিমার বিয়েটা দিতে পারিলেই এখন ভারত উদ্ধার হয় এবং ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। আমরা এখন দেখিতেছি মহাত্মা রামমোহন রায় শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া ফেলিয়াছেন। ভায়ারা যদি যথার্থই ধর্ম্মালোচনা করিতেন তবে "অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও" কথাগুলি ভুলিয়া গিয়া আজ ডাকিতেন "আলোক হইতে অন্ধকারে যাইতে পারিলেই ভাল।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী,
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।"

ইহার অর্থ কে বুঝিবে? পূজ্যপাদ ঋষিগণ কেবল কলিকালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের উদর পোষণের জন্যই বোধ হয় শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাই বলি আর অর্থে কার্য্য নাই। আবার শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না, ভায়াদের মধ্যে কেহ কেহ আচার্য্য এবং মহর্ষি শব্দের অবমাননা করিয়া স্বয়ংই আচার্য্য এবং মহর্ষি পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কলিরাজ ধন্য তোমার মহিমা! অবশেষে ভারতের ভাগ্যে এই ঘটিল।

মহর্ষি মহাশয়কে আমরা আর কিছু বলিতে চাই না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিব, কলির মহর্ষি মহাশয়! ভারতবর্ষ

ত্যাগ করিয়া আফ্রিকা খণ্ডের কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন পূর্ব্বক "মহর্ষি" কিম্বা "ব্রহ্মর্ষি" উপাধিটা গ্রহণ করিলেই ভাল হইত, কেননা যে ভারতে মনুষ্য হইতে স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত, কীট হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত, মহর্ষি শব্দের অর্থ আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারে নাই, সে ভারতে এ বিড়ম্বনা কেন? শত সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াও "মুনি ঋষি" উপাধি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যে মহর্ষির যোগভঙ্গ ভয়ে অপ্সরাগণ ভুবনমোহন রূপের ছটা অন্তর্হিত করিয়া দিগ্-দিগন্তে পলায়ন করিতেন, আজ কিনা বিলাস-বিহ্বল, দেব ধর্ম্মপরাঙ্মুখ, সমাজপরিত্যক্ত, বিকৃত মস্তিষ্ক, অন্তঃসার শূন্য ব্যক্তি মহর্ষি পদে অভিষিক্ত! সকলই কালের দোষ, কলিতে আর্য্যধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়াছে, তাই এত উৎপাত ঘটিতেছে।

আবার শ্রীপদের উপর বিস্ফোটকের ন্যায় বিপদের উপর বিপদ্, সমগ্র পুরাণ ইতিহাস পাঠ করিলে কোন স্থানে এক আধটা যোগীর নাম শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আজ কাল পথে ঘাটে যোগীর হাট বসিয়াছে, আজ আমেরিকা হইতে ব্যাপারী আসিয়া ঘোষণা করিলেন চাই "রিফাইণ্ড্ যোগ প্রত্যেকের পক্ষে মূল্য ১০৲ টাকা, আজ কাশীধামে একজন ভণ্ডযোগী ফেরি করিতেছেন চাই "ত্রাটকযোগ" মূল্য ৫৲ টাকা" এরূপ সিদ্ধপুরুষ বহুস্থানে দুই চারিটি দেখিতে পাওয়া যায়। এ যোগে দেবতার নাম নাই, মন্ত্র নাই, শম, দম, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি কোন প্রক্রিয়াই নাই, আছে কেবল শ্বাস,

প্রশ্বাস এবং অবশেষে ক্ষয়কাশ ও যক্ষ্মাকাশ। এই সকল ঘোর মিথ্যাবাদী প্রচ্ছন্ন নাস্তিক প্রতারকের দল দিন দিন মূর্খ-সম্প্রদায়ে প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুহকজাল বিস্তার করতঃ ক্রমশঃ বুদ্ধিমান্ মানবগণের বুদ্ধিকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই ভণ্ডদিগের কথায় যাঁহারা আস্থা করেন তাঁহারা বড়ই ভ্রান্ত, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সাধু বটে, কিন্তু উপায় তদ্বিপরীত, এজন্যই আমরা তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিতেছি। পরন্তু কতকগুলি মুদ্রা আছে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহা সাধিত হয়। চক্ষুকে অতিশয় বলপূর্ব্বক নিষ্পীড়ন করিলে চক্ষুর ভিতরে যে এক প্রকার আলো দেখা যায়, পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাতেও ঐরূপ একটা আলোক দৃষ্ট হয় ; তখন ঐ ভণ্ড গুরু উহাকেই পরব্রহ্মের জ্যোতিঃ বলিয়া বুঝাইয়া দেন ; এইরূপ দুই একটা 'বুজরুকি' দেখাইয়া নরপিশাচ ভণ্ডযোগী বেস্ দশ টাকা রোজগার করিতেছেন। কিন্তু আমরা বলি সাধু সাবধান। ইংরাজী নবিস্ ভায়া! তুমি ইংরাজী ভাষায় বেস্ সুশিক্ষিত হইয়াছ স্বীকার করি, ফলতঃ যোগশিক্ষা বিষয়ে তোমার হাতে খড়ি, তাই তোমার ঐ সকল ভণ্ডযোগিগণের কথায় অবিশ্বাস হয় না। দেশে সম্পূর্ণরূপে যোগ শিক্ষার অভাব হইয়াছে, তাই ধূর্ত্তগণ স্বার্থসাধন জন্য এতাদৃক্ প্রতারণা জাল বিস্তারের সুযোগ পাইয়াছে। যাহাহউক, কাচকে হীরক বলিয়া আর বুঝিও না, ভণ্ডদিগের কথা আর শুনিও না। তুমি হনুমানের মত দ্বারে বসিয়া যোগাভ্যাস করিবে, কিন্তু বিভীষণ-রূপ-ধারী তোমার ভণ্ডগুরু অন্তঃকক্ষ হইতে তোমার হৃদয়-

মন্দিরের সার সর্ব্বস্ব রামচন্দ্রের ন্যায় সনাতন ধর্ম্মকে রসাতলে লইয়া যাইবে। পরন্তু আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কত যুবক কাশীধামে গিয়া কোন ভণ্ডযোগীর নিকটে ত্রাটক-যোগ শিক্ষা করিয়া দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি লোকে ভণ্ডদিগের কথায় অবিশ্বাস করিতেছেন না; ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়! এ বিভ্রাটের হেতু কি? হেতু আর কিছুই নহে, কেবল আধুনিক বর্ণাশ্রমের ভণ্ডামী দেখিয়াই লোকে অন্য পথ অবলম্বনের চেষ্টা পাইতেছে।

লিখিতে হস্ত কম্পমান হইতেছে, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, মস্তক ঘূর্ণমান হইতেছে, ও কলেবর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এ ঘোর দুর্দ্দিনে, আমাদের দেশের কেবল কুল-রমণীগণই স্বধর্ম্মপালন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মী, তাঁহারাই সতীত্ব রক্ষা করিয়া স্বামীর-ধর্ম্মপত্নী হইয়া স্বামিভক্তি, পিতৃভক্তি ও দেবভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন; অতিথি সৎকার, তীর্থদর্শন তাঁহাদেরই আছে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, শ্রী তাঁহাদেরই আছে। পবিত্র অন্ন পাক করিয়া কলির অন্নগত প্রাণ জীবগণের জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু হায়! এ দুর্দ্দিনে তাহাও তো লুপ্ত হইতে চলিল! আজ কুলরমণীর চিরদুঃখ মোচনের ভান করিয়া ইংলণ্ড হইতে দলে দলে জেনেনা মিশন আসিয়া, ভারতের নানাস্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়াছেন, এবং বালিকাগণের পানীয় জল দিবার জন্য চণ্ডালকন্যা নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, প্রথমেই জাতিটা নষ্ট

করিতে হইবে। তাহার পর মেম গুরুমাতারা বালিকা-সংগ্রহের জন্ত লোকের বাটী বাটী ফিরিতে লাগিলেন, বাটী আসিলেই ত অগ্রে আর্য্যশাস্ত্র বর্ণজ্ঞান-বিবর্জ্জিত, বিকৃত মস্তিষ্ক, পাশ্চাত্য-বিদ্যাভিমানী, অন্তঃসারশূন্য বাবুরদল কৃতার্থ হইলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গেই গিন্নি বাবু, দিদি বাবু, দিদিমা বাবু সকলেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিলেন, মেম সাহেবের মিষ্ট বাক্যে তাঁহাদের শরীর গলিয়া গেল। বালিকাদিগকে মেম সাহেবের শুভ্র হস্তে সমর্পণ করা হইল। বাঙ্গালী আজ বঙ্গভাষা ভুলিয়া গিয়াছেন, তাই মেম সাহেব বালিকাগণকে বাঙ্গালা পড়াইতেছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বুকনি দিয়া নিজের কার্য্য উদ্ধার করিলেন, বিলাতি ধরণের নাচ, গান শিক্ষা দিলেন, আবার স্ত্রী-স্বাধীনতার মহামন্ত্রে দীক্ষিতা করিলেন। তাই দেখাদেখি কত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের কন্যা, কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্র জাতির কন্যা, বেশ্যা কন্যা, হাড়ি মুচির কন্যা ও খ্রীষ্টানের কন্যা সকলেই মেম সাহেবের কুরুক্ষেত্রে প্রচুর দক্ষিণা দিয়া সমবেতা হইলেন, চণ্ডালকন্যার হস্তে লুচি, কচুরি, মিষ্টান্ন, পানীয় জল খাইতে লাগিলেন, অনাচার, ব্যভিচার সকল গুণেই বালিকাগণ ভূষিতা হইলেন। ধন্য জেনেনা মিশন! ধন্য তোমাদের কুহক! ধন্য তোমাদের সভ্যতা! কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা আজ পর্য্যন্ত কোন মুসলমানের কন্যা মেম সাহেবের স্কুলে প্রেরিত হয় নাই, ধন্য মুসলমান! ধন্য তোমাদের একতা! ধন্য তোমাদের স্বধর্ম্ম রক্ষা। এদিকে বালিকাগণ কৃতবিদ্য হইয়া বাটীতে বলিতে লাগিলেন

"ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ," তোমাদের মাটির ও পাথ-রের ঠাকুরগুলা মিথ্যা। পিতা মাতা বড়ই আনন্দলাভ করিলেন, মনে করিলেন বালিকা বেস্ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন। তখন মেম সাহেবকে অর্থাৎ কন্যার গুরুমাকে কতই ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন; দেশের বড়ই মঙ্গল হইল, স্ত্রীলোকের চিরকুসংস্কার ঘুচিয়া গেল। কিন্তু আমরা বলিতে পারি এ সকল বালিকা যাহাদের ঘরে পদার্পণ করিবেন, তাহাদের সংসার ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া যাইবে, এই অর্থহীন ও দরিদ্র বাঙ্গালির ঘরে এই সকল বিলাস-প্রিয়া, ধর্ম্মহীনা রমণী যখন গৃহিণী হইবেন তখন আর সংসারে শ্রী থাকিবে না, লক্ষ্মীদেবী কোন্ দিকে পলায়ন করিবেন। ইহারা অন্ন পাক করিবেন না, গৃহস্থালীর কোন কার্য্য করিবেন না। স্বামিভক্তি ত থাকিবেই না, বরং স্বামীকে ক্রীতদাস বলিয়া মনে করিবেন, শ্বশুর শাশুড়ীকে শৃগাল কিম্বা কুকুর বলিয়া মনে করিবেন। বালক বালিকাকে লালন পালন করিতে পারিবেন না, কেবল বিদ্যাসুন্দর এবং নাটক পড়িবেন, কার্পেট বুনিবেন এবং বিলাসিতার প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারিলে অবশেষে কুলে কালি দিবেন। মেম সাহেবের কুরুক্ষেত্রে উপদেশ পাইয়া, বালিকাদিগের সংসার বৈরাগ্য হইবে, তৎপরে স্ত্রী-স্বাধীনতার গাণ্ডীবে বিলাসিতার ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিয়া হিন্দুকুল নির্ম্মূল করিবে। বালকগণ সাব-ধান! সংসারে আসিয়া যদি সুখী হইতে চাও, যদি হৃদয়ে শান্তি স্থাপন করিতে চাও, যদি অর্থবান্ হইতে চাও, যদি দীর্ঘ-জীবন লাভ করিতে চাও, যদি ধর্ম্মচিন্তা করিতে চাও,

এবং যদি পবিত্র অন্ন ভোজন করিতে চাও, তবে ঐ সকল বালিকার পাণিগ্রহণ কদাচ করিবে না। জেনেনা মিসন বিরুদ্ধে একজনা সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-রমণী কি বলিয়াছেন পাঠক দেখুন, যথা ঃ—

The Wild women as social Insurgents

By Mrs. Lynn Linton Page 596 of the Nineteenth Century, No. 176 October 1891 a monthly review, edited by James Knowles.

"Among these female missionaries are some who are good, devoted,pure-hearted, self-sacrificing all that women should be, all that the best women are, and ever have been, and ever will be. But also among them are the Wild Women—creatures impatient of restraint, bound by no law, insurgent to their finger-tips, and desirous of making all other women as restless and discontented as themselves. Ignorant and unreasonable, they would carry into the sun-laden East the social conditions born of the icy winds of the North. They would introduce into the Zenana the circumstances of a yorkshire home. In a country where jealousy is as strong as death, and stronger than love, they would incite the women to revolt against the rule of seclusion, which has been the law of the land for centuries before we were a nation at all. That rule has worked well for the country, in as much as the chastity of Hindu women and the purity of family life are noto-

riously intact. But our Wild Women swarm over into India as Zenana missionaries, trying to make the Hindus as discontented, as restless, as unruly as themselves. The zenana would not suit us. The meekest little mouse among us would revolt at a state of things which does not press too heavily on those who have known nothing else and inherited no other traditions. But it does not suit the people who have framed and who live under these laws; and we hold it to be an ethnological blunder, as well as a political misdemeanor, to send out these surging apostles of disobedience and discontent to carry revolt and confusion among our Indian Fellow-Subjects."

এইত কলির প্রথম নমুনা। আরও কত দেখিতে হইবে তাহা জানি না। কিন্তু আজ ভারতে এদেশই খ্রীষ্টানের প্রাবল্য কেন? এই বিষম বিভ্রাটের কারণ কি? সহস্র সহস্র লোক মুসলমান, খ্রীষ্টান্ এবং নাস্তিক হইলেন কেন? শত শত লোক বাজারে যোগশিক্ষা ক্রয় করিয়া মূর্খতা প্রকাশ করিতেছেন কেন? কোমল হৃদয়া বালিকাদিগকে মেম (পূতনা) সাহেবের হস্তে সমর্পণ করা হইতেছে কেন? আমরা কাহারও উপর দোষারোপ করিব জানি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আর্য্যসমাজ এবং ধর্ম্মরক্ষক ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ যদি পেটের দায়ে স্বধর্ম্মত্যাগ না করিতেন এবং অনাচারী না হইতেন ও সমস্ত অপকর্ম্ম একচেটে করিয়া না লইতেন তবে ঋষিগণের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ আজ নরকবৎ প্রতীয়মান হইত না।

ভারতের ব্রাহ্মণ (দুই চারিটি স্বধর্ম্মপালন করেন বটে কিন্তু, তাঁহাদের দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধন হইতে পারে না), আজ স্বেচ্ছাচারী হইয়া দাসত্ব করিতেছেন, শাস্ত্রের নিষেধ মানিতেছেন না, অখাদ্য ভোজন করিতেছেন, কেহ বা গোপনে, কেহ বা প্রকাশ্য ভাবে যবনান্ন ভোজন করিতেছেন, স্বেচ্ছাচার, ব্যভিচার ও পাপাচারের আকর হইয়াছেন, আবার কেহ বা তন্ত্র শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, অবৈধ মদ্য মাংস খাইতেছেন, কেহ বা শুক্র বিক্রয় করিতেছেন, কেহ বা বল্লালসেনের দোহাই দিয়া শত শত ভাগ্যহীনা বনিতার পাণিগ্রহণ করতঃ ব্যভিচারে ভারতকে কলুষিত করিতেছেন। ব্রাহ্মণই ত প্রথমে বিলাতগমনের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণইত প্রথমে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আদর্শ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের পাপাচার ভারত আর বহন করিতে পারেন না, তাই আজ ভারতে ঘন ঘন ভূমিকম্প, ঘন ঘন উল্কাপাত, ঘন ঘন ধূমকেতুর আবির্ভাব, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও সংক্রামক পীড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব ঘটিতেছে। চিরদুঃখিনী কুলীন রমণীগণের দীর্ঘনিশ্বাসরূপ অগ্নি আজ ভারতের চারিদিকে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, তাই আজ সোণার ভারত ছারখার হইতেছে। হা বল্লালসেন। আজ তুমি কোথায়? কি কুক্ষণে তুমি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? কি অশুভক্ষণে তুমি রাজা হইয়াছিলে? তুমি কৌলীন্য প্রথা সৃষ্টি করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছ! আজ কুলরমণীগণের চক্ষের জল কে মুছাইয়া দিবে? ইংরাজ-রাজ! তুমি যদি কৃপাকটাক্ষপাত

কর, তবেইত কুলীন রমণীর চিরদুঃখ নিরাকরিত হইবে, নচেৎ উপায়ান্তর নাই। এই অযশস্কর কার্য্য দেখিয়াই ত ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়, হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থা হয়, অবিশ্বাস হয়, তাই এত লোক হিন্দুধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছে।

প্রতিমা পূজা। অব্যবহিত মুক্তির কারণ যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা চঞ্চল এবং সমল মনে উদিত হয় না; চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া তাহাকে নির্ব্বাত দীপ তুল্য সুস্থির করা, পরমেশ্বরের উপাসনার কর্ম্ম, এবং মনোমালিন্য সম্যক্‌রূপে পরিষ্কার করণ পূর্ব্বক উহাকে বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল করা, ঈশ্বরে প্রগাঢ় অথচ নৈষ্ঠিকী ভক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও সাধ্য নাই। অপিচ সেই দৃঢ় ভক্তি তাহা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাদির দ্বারাই লব্ধ হয়। মনঃ অদৃশ্য বস্তুর ধারণায় নিতান্ত অশক্ত, অতএব ধেয়মূর্ত্তির বর্ণনা মাত্র শ্রবণে তাহার চিন্তা করা দুঃসাধ্য, সুতরাং তদাকারাকারিত বৃত্তি উদয়ার্থে সেই মূর্ত্তি পটে চিত্রিত অথবা মৃত্তিকাদিতে নির্ম্মিত করিয়া পূজা করিলে, ধ্যানার্চ্চনা উভয়েরই উপযোগী হয়। কিন্তু ঐ প্রকার আরাধনা প্রত্যহ হওয়া সুকঠিন, এজন্য বিশেষ বিশেষ দিন অবধারিত হইয়া কতিপয় বিগ্রহ-সম্বন্ধে দৃঢ় শাসনও হইয়াছে, অর্থাৎ পর্ব্বে পর্ব্বে সেই সেই পূজা অকরণে প্রত্যবায় রূপ ভয়, এবং তৎ-করণে স্বর্গ-ভোগাদি উৎকৃষ্ট ফলের প্রলোভন দর্শিত হইয়াছে, কিন্তু এরূপ প্রতিমা পূজা কেবল ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃকই সমাহিত হইবে, অন্য কোন বর্ণের অধিকার নাই, তবে ব্রাহ্মণ পূজা করিলে কুন্তী

তাহার ফলভোগ করিবেন। পরন্তু এরূপ পূজার বিধিও বড় সহজ নহে, উপাস্য-বিগ্রহের ধ্যান ও পূজা প্রথমতঃ স্বহৃদয়ে করণানন্তর, তাঁহাকে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া ঈড়া নাম্নী নাড়ী পথে বহির্গত করিয়া, সম্মুখস্থিত সিংহাসনে উপবেশন করাইলাম, এইরূপ জ্ঞানে পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করতঃ পুনর্ব্বার সংহারমুদ্রা প্রদর্শনে, সেই পথে তাঁহাকে লইয়া গিয়া স্বস্থানে স্থাপন করিতে হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বর যেমন প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে আছেন, তদ্রূপ বাহিরেও আছেন, অর্থাৎ তাহার সত্বারহিত স্থান নাই, অতএব গন্ধপুষ্পাদি তাঁহার চরণ-কমলে প্রদান করিতেছি এমন মনে করিয়া যে কোন স্থানে তাহা অর্পণ করা যায়, তাহাতেই তাঁহার পূজা সিদ্ধ হইতে পারে, এজন্যই প্রতিমা পূজার বিধি হইয়াছে। ফলতঃ আজকাল সেরূপ শাস্ত্রানুমোদিত পূজা আর নাই, যজমানের বাটীতে প্রতিমা পূজা উপস্থিত হইলে, পুরোহিত ঠাকুর একদিনে দশ বার খানি প্রতিমা পূজা করিবেন, কিন্তু, পূর্ব্বে একদিনে একখানি প্রতিমা পূজা করা বড়ই কষ্টকর ছিল। কৃতী আজকাল সভ্য ভব্য হইয়াছেন, স্বয়ং উপবাস করিতে অক্ষম, তাই পুরোহিত ঠাকুরের উপর উপবাসের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত, পুরোহিত ঠাকুর কিন্তু বড়ই চতুর ১০।১২ খানি প্রতিমা পূজা করিয়া বাটী আসিতে অনেক বিলম্ব হইবে, তাই তিনি গোপনে এক পেট "ভিজান" (উহাকে তাঁহারা অন্ন মধ্যে গণনা করেন না) অথবা অন্ন ভোজন করিয়া ফোটা কাটিয়া যজমানের বাটীতে উপস্থিত হইবেন,

প্রতিমার সম্মুখে উপবেশন করিয়া নৈবেদ্য, বস্ত্র এবং দক্ষিণা-দির দিকেই ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, পুরোহিতের নিষ্ঠা নাই, ভক্তি নাই, শ্রদ্ধা নাই, অধ্যয়ন নাই, আচার নাই, বিচার নাই, সন্ধ্যা নাই, আছে কেবল মানব আকৃতিটি—এইতো পুরোহিতের লক্ষণ ; ভূত শুদ্ধি নাই, দেবতার আহ্বান নাই, মন্ত্র নাই, তাই দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল না, চৈতন্য হইল না, সুতরাং বিধিপূর্ব্বক পূজাও হইল না, হইল কেবল কতকগুলি বলিদান। বলির পক্ষপাতী শাস্ত্রে বলির দ্বারা পশুর স্বর্গলাভ ও যজমানের অভীষ্টলাভ হয় বলিয়া বলিদানের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে। আবার যে সকল শাস্ত্র বলির বিরুদ্ধবাদী তাহাতে আবার বলির দ্বারা পশুর ও যজমানের স্বর্গাদি লাভের পরিবর্ত্তে নরক লাভ হয় বলিয়া স্থানে স্থানে বলিদানের নিন্দাবাদ কথিত হইয়াছে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে মৃত্যুকালে হৃদয়ে যেরূপ উপস্থিত হয় দেহান্তে তাহাকে সেইরূপ অবলম্বন করিতে হইবে। জীবমাত্রেই এই ঐশিক নিয়মের বশীভূত। আমাদের আরাধ্য দেবতার সম্মুখে পশু বলি হয়, সুতরাং পশুর মৃত্যুকালে দেবভাব, দেবরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা। যদি তাহা হয় তবে পশু কেন দেবত্ব লাভ করিতে পারিবে না ? কিন্তু মন স্বভাবতই চঞ্চল, বিশেষতঃ মৃত্যু যাতনায় আরও অস্থির হইয়া সম্মুখে দেবমূর্ত্তি থাকিলেও পশুর মনে ভাবান্তর হইতে পারে। এই জন্য সাধকের অথবা তৎস্থানবর্ত্তী পুরোহিতের কতকগুলি ক্রিয়া সাধন করিবার আবশ্যকতা। পশুর মনে দেবভাব বা দেবরূপ

উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সাধক বা পুরোহিত পশুর কর্ণমূলে কতকগুলি বীজমন্ত্র শ্রবণ করাইবেন, এবং আরও কতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন। তৎপরে "প্রদর্শয় স্বর্গং নিয়োজয় মুক্তিং প্রয়োজয় ইমং পশুং মোক্ষং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পুরোহিত বিশুদ্ধান্তঃকরণে তদ্গতচিত্তে পশুর স্বর্গলাভের নিমিত্ত অর্থাৎ পশুর হৃদয়ে দেবীরূপ উদিত হইবার নিমিত্ত ইষ্টদেবতার নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিতে থাকিবেন। সুতরাং তপোনিষ্ঠ সাধক বা পুরোহিতের এইরূপ প্রার্থনা বলে মৃত্যুকালে পশুর হৃদয়ে দেবভাব উপস্থিত হইয়া তাহাকে দেবত্বে পরিণত করাইয়া থাকে। ইহাই বলির মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্যাপার বড়ই কঠিন। ঠিক মৃত্যু সময়ে পশুর মনে দেবভাব উপস্থিত হওয়া চাই। নচেৎ বিষম বিভ্রাটের কথা। পশুর মনে দেবভাব জাগরূক করাইবার মুখ্যপাত্র একমাত্র পুরোহিত। যদি পুরোহিত তাদৃশ আচারনিষ্ঠ, ক্রিয়ানিষ্ঠ না হয়েন, যদি পুরোহিতের তাদৃশ তপোবল, সাধনবল না থাকে, অথবা যদি তাহার ভক্তি ও একাগ্রতা বা মন্ত্রসিদ্ধি না থাকে কিম্বা মন্ত্রাদি যথোচিত রূপে উচ্চারিত না হয়, তবে তাহার প্রার্থনায় পশুহৃদয়ে দেবভাব উপস্থিত হইবে না। এখন আমরা বলিতে পারি এরূপ পুরোহিত কি আর এদেশে আছেন, না আর কখন ভারতে জন্মগ্রহণ করিবেন? আজকাল কর্ম্মকর্ত্তা অর্থাৎ যজমানের যেরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর গোড়া পুরোহিতেরও যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা, তাহাতে বলি কেবল অনর্থের কারণ ভিন্ন আর কিছুই হয় না। কেননা স্বয়ং পার্ব্বতী বলিয়াছেন যথা—

মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসাঃ পশু-ঘাতনং।
আকল্প কোটি নিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ॥

অস্যার্থঃ—পার্ব্বতী বলিতেছেন, হে শিব! আমায় প্রীত্যর্থে যে সকল তামস-ব্যক্তি পশুঘাত-রূপ বলিদান করে তাহারা কোটিকল্প কাল নিশ্চয় নরকে বাস করে। অবৈধ পশুবধের শাস্তি বড়ই গুরুতর, কিন্তু কে বা মানে? আর কে বা শুনে? যজমান বলিদানের পূর্ব্বে মশলা বাঁটাইয়া রাখিয়াছেন, বন্ধু সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন, ভোগের আগে প্রসাদ হইয়া গিয়াছে, তৎপরে মদ্য, মাংস, নাচ, তামাসা ইত্যাদি ধুমধামের সহিত পূজা হইয়া গেল। এই প্রকার আধুনিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের তামসিক পূজার পাপাচার এবং কদাচার দেখিয়াই তো আজ যুবকগণের মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাই বহু দিন হইতে হিন্দু ধর্ম্মে তাহাদের অনাস্থা এবং অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইয়াছে।

আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে, পিতৃশ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে, শ্রাদ্ধ করাইবেন কে? উপরিউক্ত পুরোহিত ঠাকুরই শ্রাদ্ধ করাইবেন। পুরোহিত ঠাকুরের ত বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত নাই। সুতরাং মন্ত্রগুলিও মুখে উচ্চারিত হইল না, কেবল দানের দ্রব্যগুলি বন্ধন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এই পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সমাধা হইল। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে, কিন্তু বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে কি ফল পাঠক মহাশয় দেখুন, যথা—

একৈককমপি বিদ্বাংসং দৈবে পিত্রে চ ভোজয়েৎ।
পুষ্কলং ফলমাপ্নোতি নামন্ত্রজ্ঞান্ বহূনপি।
যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ হব্য কব্যেষমন্ত্রবিৎ।
তাবতো গ্রসতে প্রেত্য দীপ্ত শূলষ্ট্যয়োগুড়ান্।

অন্বয়ার্থঃ—দৈব ও পিতৃকার্য্যে বেদবিৎ একজনকেও যদি ভোজন করান যায়, তাহাতে মহা ফললাভ হয়, বেদানভিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও তদ্রূপ ফললাভ হয় না। প্রত্যুত বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তি দৈব ও পৈত্র কার্য্যে যত গ্রাস ভোজন করেন শ্রাদ্ধকর্ত্তা মৃত্যুর পর ততগুলি প্রজ্বলিত শূল, ঋষ্টি নামক অস্ত্র ও লৌহপিণ্ড গ্রাস করিয়া থাকেন। এখন দেখুন আমাদের দেশে শ্রাদ্ধ কার্য্য উপলক্ষে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ভোজন করান যায় তাহাদের মধ্যে কয়জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ থাকে? এই বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-ভোজনে ক্রিয়া ত অঙ্গহীন হইবেই, অপরন্তু ক্রিয়া কর্ত্তাকে যে নরকে পড়িয়া জলন্ত লৌহপিণ্ড ভোজন করিতে হইবে তাহার উপায় কি? এখন আমরা বলিতে পারি ব্রাহ্মণের দোষেই বর্ণ-ধর্ম্ম ডুবিয়া গিয়াছে। আধুনিক বর্ণধর্ম্ম পালন করিলে কেবল পাপাচার হইবে। যুবকদের মনে এই প্রকার নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাই হিন্দুধর্ম্মে আর শ্রদ্ধা থাকে না।

গুরুগিরি—

মাতৃতঃ পিতৃতঃ শুদ্ধঃ শুদ্ধভাবো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বাগমানাং সারজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্ববিৎ।
পরোপকারনিরতো জপ পূজাদিতৎপরঃ।
অমোঘবচনঃ শান্তো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।

যোগ মার্গার্থ সন্ধায়ী দেবতা হৃদয়ঙ্গমঃ।
ইত্যাদি গুণ সম্পন্নো গুরুরাগম-সম্মতঃ॥

অস্যার্থঃ—পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে যিনি শুদ্ধদেহ, শুদ্ধভাব, জিতেন্দ্রিয়, সমস্ত তন্ত্রের সারজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, পরোপকারে নিরত, জপ পূজাদি অনুষ্ঠানে তৎপর, সত্যবাদী, অথবা নিজতপঃ প্রভাবে অব্যর্থ বাক্য, শান্ত, বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী, যোগমার্গের তত্ত্বানুসন্ধায়ী এবং নিজ হৃদয়ে দেবতার আবির্ভাব বিশিষ্ট ইত্যাদি গুণ সমূহে যিনি সম্পন্ন তিনিই তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত গুরু।

এইরূপ জ্ঞান সম্পন্ন গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া আরাধনা করিতে হইবে। যথা—

কাশীক্ষেত্রং নিবাসোঽস্য জাহ্নবী চরণোদকং।
গুরুর্বিবশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্মতত্বচঃ।

অস্যার্থঃ—গুরুর নিবাস স্থান কাশীক্ষেত্র, তাঁহার চরণোদক স্বয়ং জাহ্নবী গুরুদেব সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর এবং তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত মহামন্ত্রই স্বয়ং তারকব্রহ্ম।

অন্যচ্চ।—ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং সিদ্ধিমূলং গুরোঃ কৃপা।

অস্যার্থঃ—গুরুর মূর্ত্তি ধ্যানের মূল, গুরুর পাদপদ্মই পূজার মূল, গুরুর বাক্যই মন্ত্রের মূল এবং গুরুর কৃপাই সিদ্ধির মূল।

আবার গুরুকে প্রণাম করিতে হইলে এই মন্ত্র চাই যথা—

অখণ্ডং মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

অস্যার্থঃ।—অখণ্ড মণ্ডলাকার অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চরাচর যৎকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, সেই ব্রহ্মপদ যৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে সেই গুরুদেবকে প্রণাম। জ্ঞানময়ী অঞ্জন শলাকা দ্বারা অজ্ঞানরূপ তিমিরে অন্ধজীবের চক্ষুঃ যৎকর্ত্তৃক উন্মীলিত হইয়াছে সেই গুরুদেবকে প্রণাম। যাহার প্রসাদে বিশ্বময় ব্রহ্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়, জ্ঞাননয়ন উন্মীলিত হয়, তিনি মানবদেহে অধিষ্ঠিত হইলেও স্বরূপতঃ মানব নহেন।

এরূপ বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী এবং তত্ত্বজ্ঞানী গুরু কৈ? যদি কেহ থাকেন তবে পর্ব্বতের নিভৃতস্থানে লুক্কায়িত আছেন। তাহাতে হিন্দু সমাজের উপকার কি? "সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তাচ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে" গুরু সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা এবং গৃহস্থ হইবেন তাহার কারণ গুরু অন্যদেশস্থ হইলে তাঁহার নিকটে উপদেশাদি গ্রহণ, এবং তাঁহার সেবা শুশ্রূষা শিষ্যের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে তাই গুরু সর্ব্ব শাস্ত্রার্থবেত্তা এবং গৃহস্থ হইবেন। কিন্তু এরূপ গুরুই বা কৈ? আজ সেই গুরুর স্থানে কুলগুরু উপাধিধারী নরাকারে এক নূতন জীব অবতীর্ণ হইয়াছে। কোন্ মন্ত্রে কোন্ শিষ্যকে দীক্ষিত করিতে হয় তাহা তো জানিবেনই না, আবার অধ্যয়ন নাই, অধ্যাপনা নাই, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, ভক্তি নাই, আচার নাই, সন্ধ্যা

নাই, ধর্ম্ম নাই, এমন কি মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত নাই। ইহারা গুরু ব্যবসায়ী অথবা গুরুত্ব উপজীবী। অর্থাৎ ইহাদের গুরুগিরি কেবল অর্থোপার্জ্জনের একটি উপায়। আজ কাল-কার গুরু তো নামে গুরু, কার্য্যে দাস হইয়া বার্ষিকবৃত্তির জন্য জঘন্য ম্লেচ্ছবৃত্তি-শিষ্যের দ্বারে পড়িয়া কুকুরের ন্যায় তাড়িত হইতেছেন অথবা তাহারই পাত্রোচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেছেন। দুঃখের কথা বলিব কত, সুরা ও বেশ্যার বিলাসের ভোগে গুরু আজ পাচকের কার্য্যে ব্রতী। কত গুরু লাম্পট্য দোষ জন্য শিষ্যবাটী হইতে দূরীভূত হইয়াছেন, কত গুরু অখাদ্য ভোজন করিতেছেন, তাহাদের মহা-পাতকেই ভারত রসাতলে গিয়াছে, তাহাদের দোষেই আজ শিক্ষিত যুবক আর্য্য ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতেছেন। এখন আমরা বলিতে পারি, এই সকল ধর্ম্মের ভান করিয়া পাপাচার, ব্যভিচার, এবং ভণ্ডামী দেখিয়াই তো কত সহস্র লোক মুসলমান এবং খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে, তাই আজ দুগ্ধপোষ্য বালক পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের দিকে ছুটিতেছে। আমরা তাহাদের কিছুমাত্র দোষ দেখিতে পাই না, দোষ কেবল কলির ব্রাহ্মণের।

মনুষ্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, উত্তম, মধ্যম, এবং অধম। যিনি ঈশ্বরের ভয়ে পাপাচার করেন না তিনিই উত্তম হয়েন। যিনি লোক ভয়ে কুকর্ম্ম করেন না তিনি মধ্যম, এবং যিনি দণ্ডভয়ে পাপাচরণ করেন না তিনি অধম। কিন্তু, হিন্দু! আজ তুমিই অধম শ্রেণীর মানব। তোমার সমাজ নাই, ধর্ম্ম নাই, নীতি নাই, শিষ্টাচার নাই, শীলতা

নাই, তাই আজ ভারতে এত ব্যভিচার, কুনীতি, উচ্ছৃঙ্খলতার প্রাবল্য, গৃহ বিচ্ছেদে তোমার সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। তোমার শান্তির জন্য ইংরাজকে নূতন নূতন আইন প্রচার করিতে হইতেছে। তোমার পূর্ব্ব কীর্ত্তি দেখিয়া শুনিয়া ইংলণ্ড হইতে পণ্ডিত মোক্ষমূলার ভারতকে ভূলোক, স্বর্গ, ভারতবাসীর মন অত্যুন্নত জ্ঞান করিয়া থাকেন। ভারতের ভাষা, ভারতের নীতি, ভারতের রীতি, ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের অধিবাসী ও ভারতের মৃত্তিকা মোক্ষমূলারের বড়ই প্রিয়। তাই তিনি বলিয়া থাকেন—

"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow—in some parts "a very paradise" on earth – I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them, which will deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to India"

হিন্দুকে মিথ্যাবাদী বলায় তিনি বিদ্রূপচ্ছলে বলিতেছেন "Are all these two hundred and fifty three millions of human beings to be set down as liars, because some hundreds say, even some thouands of Indians, when they are brought to an English court of law on suspicion of having committed theft or murder do not speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth.

তাঁহার ধারণা প্রকৃত হিন্দু গ্রাম্যমণ্ডলীতে মিলে, সভ্যতালোকিত সহরে পাওয়া যায় না। প্রকৃত হিন্দু, সরল, সত্যবাদী, দয়ালু, মানবোচিত বহুগুণ সম্পন্ন। তাহাকে কোর্টে লইয়া গেলে সে আর সেরূপ থাকে না। তিনি নানা প্রমাণ দ্বারা ভারতবাসীর সত্যনিষ্ঠা দেখাইয়া বলিতেছেন—

"I do wish it to be understood and accepted as a fact that the damaging charge of untruthfullness, brought against the people is utterly unfounded with regard to ancient times. It is not only not true, but very opposite of truth".

কিন্তু হায়! তোমার পূর্ব্ব কীর্ত্তি আজ তোমার স্মরণ নাই। তোমার পশ্চাৎ দৃষ্টি নাই, তাই আজ সকল কুনীতির আকর হইয়াছ। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা কতই শিখিয়াছ, সেই জন্ম ইংরেজকে "পিনাল কোড্" জারী করিতে হইয়াছে, কিন্তু তথাচ তুমি ভ্রূক্ষেপ কর না। পুত্র কৃতবিদ্য হউন, আর না হউন, যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী ভাষা শিখিতে পারিলেই তুমি অর্থ লালসায় কিম্বা ঋণ পরিশোধের জন্য বাল্যকালেই পুত্রের বিবাহ দিলে, বিবাহ দিলে বটে, কিন্তু কন্যাকর্ত্তার গলায় পা দিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলে। আবার তোমার পুত্রবধূর ১০ দশ বৎসর বয়ঃক্রম না হইতে হইতেই তাহার পিতামাতার ক্রোড় হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনিলে, সেই দিন হইতেই হতভাগ্য পিতা মাতাকে এবং বালিকাকে স্নেহ মমতা সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হইল, তাহাদের মনের দুঃখ মনেই রহিল। তোমার সাধের জিনিস তোমার ঘরে

আসিলেন কিন্তু তুমিত শাস্ত্রের অনুশাসন পালন কর না, তোমার সে আর্য্যজীবন আর নাই, পুত্র কন্যাকে কিরূপ লালন পালন করিতে হয় তুমি তা জান না। তুমি আজ স্বেচ্ছাচারী হইয়াছ, তাই তোমার পুত্র এবং পুত্রবধূর অপরিপক্ক বয়সেই এক খাটে শয়ন করাইয়া সোনার 'রাম সীতা' দেখিলে—তোমার চক্ষু জুড়াইল, জীবন সফল হইল। তোমার পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা এই পর্য্যন্তই হইল। তুমি যেমন শিষ্টাচারী তোমার পুত্রও ততোধিক শিষ্টাচারী হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই পৌত্রের মুখ দর্শন করিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিলে। কিন্তু হায়! তোমার পুত্র নিৰ্জ্জীব এবং অল্পায়ু হইলেন, তোমার অল্প বেতনে সংসার নির্ব্বাহ হয় না, তাই তখন পুত্রের উপর সংসারের ভারার্পণ করিলে, পুত্র চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, "কোথায় টাকা, কোথায় চাকরি" ভাবিয়া ভাবিয়া শীঘ্র রুগ্ন হইলেন, ক্রমশই অল্প দিন মধ্যেই পুত্র কাল কবলে পতিত হইলেন। সেইরূপ তোমার সাধের পৌত্র ও যিনি পিতা মাতার অপক্ক শুক্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, অল্প দিন মধ্যেই মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন। তখন তুমি হা ভগবান! এই করিলে এই কি তোমার বিচার! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলে কিন্তু আমরা বলি "দোষ কারও নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"। তুমি—গর্ভাধান সংস্কার বলিয়া একটা বাহ্যাড়ম্বর কর, তোমার সে সংস্কার আর নাই। এখন "পুনর্ব্বিবাহ" একটা নূতন রোগ এ দেশে সংক্রামিত হইয়াছে। পুনর্ব্বিবাহের অনাচার ও কুনীতি

শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। হিন্দু! তোমার জীবনে ধিক্, তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই, তুমি কাণ্ডজ্ঞান রহিত, তাই তোমার বালিকা পত্নীর প্রথম রজোদর্শনের পূর্ব্বেই তুমি বলপূর্ব্বক সহবাস করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হও না। কি সর্ব্বনাশ! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তাই ইংরাজরাজ বালিকা পত্নীদের চিরদুঃখ মোচন করিবার জন্য সহবাস আইন পাস্ করিয়াছেন। তুমি ইংরাজকে অনেক শাস্ত্রবচন শুনাইয়াছিলে, কিন্তু তুমি নিজে ত শাস্ত্রানুশাসন গ্রাহ্য কর না, তোমার ত ধর্ম্মভয় নাই, তোমার ত লোকভয় নাই, তাই তোমার পাপাচার নিবারণ জন্য ইংরাজ দণ্ডবিধি করিয়াছেন। তাই আমরা বলি হিন্দু! তুমি অধমশ্রেণীর মানুষ বলিয়া আজ পরিচিত হইলে। তোমার এ অধম জীবনে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কঠোর অনুশাসন পালন করিবার আর তোমার সাধ্য নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আছে বলিয়া আর বৃথা চীৎকার করিও না।

হিন্দু! তুমি ত আজ অনার্য্য হইয়াছ, তোমার সহধর্ম্মিণী তোমারই কর্ম্মদোষে আজ বিলাসিনী হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে তোমার বিদ্যাবুদ্ধির প্রতিভা নাই। ঋণ করিয়া হউক, চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই হউক, তোমার বিলাসিনীকে অলঙ্কারে ভূষিতা করিতে পারিলেই তিনি তুষ্টা হইবেন, এবং তুমিও কৃতার্থ হইবে। তোমার বিলাসিনীর সন্তোষজন্য আজ তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছ, তোমার জপ নাই, তপ নাই, ঈশ্বর চিন্তা নাই, মনুষ্যত্ব নাই, এমন কি চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেছ, চাকুরি করিয়া

উৎকোচ গ্রহণ করিতেছ। প্রাণতুল্য ভ্রাতার সহিত চির-বিচ্ছেদ করিতেছ। তোমার পিতৃভক্তি নাই, মাতৃভক্তি নাই, সাক্ষাৎ দেবতা সেই বৃদ্ধ পিতামাতাকে তুমি আর শ্রদ্ধা কর না—শ্রদ্ধা করা দূরে থাক্ এমন কি তাঁহারা পেট ভরিয়া খাইতে পান্ না, তাঁহাদের পীড়ার সময়ে তুমি কখনই তাঁহাদের শুশ্রূষা কর না। আবার তোমার সখের বিলাসিনীর মধুর বচনে তাঁহাদের নয়ন হইতে অবিরাম বারি নির্গত হইতেছে, কিন্তু তুমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ কর না, তোমার বিলাসিনীর ভ্রূকুটি-কুটিল নয়ন দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই কম্পমান হইতেছে। হায় হিন্দু! এখনও তুমি জীবিত আছ? এখনও তোমার মস্তকে বজ্রপতন হয় নাই কেন? তুমি নিশ্চয় জানিবে তোমার পিতা মাতার চক্ষুর একবিন্দু জলে যখন তোমাকে গভীর নরকার্ণবে ডুবাইয়া দিবে, তখন তোমার বিলাসিনী কোথায় থাকিবেন? আবার সেই চিরব্রহ্মচারিণী বিধবাকে সাক্ষাৎ দেবী বলিয়া তুমি পূজা কর না, যে বিধবা সংসারের সুখৈশ্বর্য্যকে পদাঘাত করিয়া কেবল তপোনিষ্ঠায় পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, যে বিধবার সতীত্ব আজ সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিতেছে, যে বিধবার পুণ্যপ্রভাবে ভারত এখনও রসাতলে যায় নাই, যে বিধবা অন্নপাক করিলে মহাপ্রসাদ বলিয়া মনে হয়, আজ কিনা তোমার বিলাসিনীর কুহকে পড়িয়া তুমি সেই ব্রহ্মচারিণীকে যথেচ্ছ অবমাননা কর. সেই দেবী আজ তোমার সংসারের দাসী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জীব। এক সন্ধ্যা এক মুষ্টি ভোজন

করিয়া বিধবা তোমার সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতেছেন, এমন কি বিষ্ঠা পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিতেছেন। তাঁহার দেব সেবার হস্তে তোমার বিলাসিনীর পদসেবা পর্য্যন্ত করিতেছেন। কিন্তু হায়! এত করিয়াও ত তাঁহার মন পাইলেন না, তোমার বিলাসিনী আজ তাঁহাকে কটু বচন বলিতেছেন, উঠিতে বসিতে পদাঘাত করিতেছেন, কিন্তু ব্রহ্মচারিণী আর কত সহ্য করিবেন, তাই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন, তাই তোমার মনে শান্তি নাই, তাই তোমার অকালে পুত্রশোক, তাই তোমার জামাতৃশোক, তাই তুমি চিরদরিদ্র, তাই চিররুগ্ন এবং তাই তুমি অল্পায়ু। এই তো তোমার নীতি, এই তো তোমার রীতি, এই তো তোমার শিষ্টাচার, এই তো তোমার ধর্ম্ম এবং এই তো তোমার মনুষ্যত্ব। তবে আর কোন সাহসে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কঠোরতম অনুশাসন পালন করিতে চাও?

হিন্দু! আর্য্যদিগের প্রণীত জীর্ণ বেদবেদান্ত এবং উপনিষৎ তোমার ভগ্ন সিন্দুকে আছে বলিয়া তুমি দর্প কর, কিন্তু তুমি ত তাহার মর্ম্ম জান না। তুমি চিনির বলদ হইয়া রহিলে কিন্তু ইংলণ্ডবাসী মোক্ষমূলার (যাঁহাকে তুমি ম্লেচ্ছ বলিতে লজ্জিত হও না) কি বলিতেছেন, দেখ—আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিতেছেন, যথা—

"The self within was drawn towards the Highest self, it found its true self in the Highest self and the oneness of the subjective with the objective self underlying all reality, as the dim dawn of religi on—as the pure light of philosphy."

উপনিষৎ সম্বন্ধে (Schopenhawer) বলিতেছেন—

"In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads—It has been the solace of my life—it will be the solace of my death."

পূজ্যপাদ আর্য্যদিগের প্রণীত নীতিশাস্ত্র সকল আজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের উদর পোষণ করিতেছে, কিন্তু তুমি আবার দর্প করিয়া ইংরাজকে বল ইংরাজ তোমার বাহুবল আছে, বন্দুক আছে, কিন্তু তোমার নীতি নাই, তুমি হিন্দুর নিকটে নীতি শিক্ষা কর কিন্তু হা কপাল! আজ তোমার নীতি কোথায়? তুমি ত কখনও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন কর নাই, তুমি ত কখন নীতির অনুশাসন পালন কর নাই, তোমার নীতির কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুমি সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছ; এমন কি কোন্ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয় আজ তুমি তাহাও ভুলিয়া গিয়াছ, তাই তোমার নীতি শিক্ষা জন্য ইংরাজকে ৫ আইন জারী করিতে হইয়াছে। তুমি এখন অসম্পূর্ণ মানুষ হইয়াছ, তবে আবার কোন্ সাহসে সেই বীরপুরুষদিগকে যবন এবং ম্লেচ্ছ বলিয়া থাক? তুমিত তাঁহাদের হইতে অধমতম, তাঁহাদের জাতি আছে, ধর্ম্ম আছে, নীতি আছে, একতা আছে, বীর্য্য আছে, বুদ্ধি আছে, বল আছে, সাহস আছে, অধ্যবসায় আছে, স্বজাতি প্রিয়তা আছে, কিন্তু তোমার তো একটীও গুণ নাই, তবে তুমি মানুষ কিসে? বরং আমরা বলিতে পারি, তুমি পশু অপেক্ষাও অধম, পশুগণ নিজ নিজ ধর্ম্মপালন করে,

নির্দ্দিষ্ট বস্তু ভোজন করে, অন্যের ভোজ্যবস্তু কখনই স্পর্শ করে না, কিন্তু তুমি আজ সর্ব্বভুক্‌। তোমার আহারের বিচার নাই, পেটের দায়ে সনাতন ধর্ম্মটা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলে। পশু সকল জিতেন্দ্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, এক সঙ্গে একস্থানে গাভীগণ চরিতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! গাভী ঋতুমতী না হইলে, কিম্বা গর্ভবতী থাকিলে সেই ধার্ম্মিক চূড়ামণি জিতেন্দ্রিয় যণ্ড কখনই তাহাকে স্পর্শ করিবে না—এই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও ত তোমার চৈতন্য নাই, তুমি শাস্ত্রের অনুশাসন পালন কর না, তাই তোমার বিলাস-প্রিয়া পত্নীতে উপগমনে শাস্ত্রানুমোদিত নিয়ম সকল প্রতিপালন কর না, বরং সে পক্ষে তুমি এখন যথেচ্ছাচারী হইয়াছ, তাই তুমি এবং তোমার বংশধরগণ বীর্য্যহীন, বলহীন, বুদ্ধিহীন, ধর্ম্মহীন, অর্থহীন, চিররুগ্ন এবং অল্পায়ু, তাই তোমার দাসত্ব-লব্ধ অন্ন ব্যতীত জীবন ধারণের আর কোন উপায় নাই। শাস্ত্রের অনুশাসন কিছুমাত্র পালন কর না, কিন্তু "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" আছে বলিয়া লোকের চক্ষে ধূলা দিতেছ, মানুষের চক্ষে ধূলা দিতেছ বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ ঈশ্বরের নিকটে কেবল "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, আছে বলিয়া কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

এই সকল শোচনীয় ব্যাপার চৈতন্যদেব চারিশত বৎসর পূর্ব্বে দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন, এবং জানিতে পারিয়াছিলেন যে, একালের মানব বীর্য্যহীন ও স্বেচ্ছাচারী হইবে, বিলাস-প্রিয় হইয়া ধর্ম্ম এবং অর্থ নাশ করিবে, আচারভ্রষ্ট হইয়া বর্ণ সকল স্ব স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে, আহারের বিচার

থাকিবেক না, বর্ণ এবং বর্ণধর্ম্ম লুপ্ত হইবে, স্বজাতিপ্রিয়তা থাকিবেক না, লোকে তামসিক প্রতিমা পূজা করিয়া .পাপ-গ্রস্ত হইবে, শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ অভাবে শ্রাদ্ধ ও ব্রতাদি পণ্ড হইবে। সকল বর্ণ শূদ্র হইয়া ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইবে, সদ্‌গুরু অভাবে লোকের অধোগতি হইবে, ভারত ধর্ম্ম শূন্য হইবে, সুতরাং জীবের নিস্তারের উপায় থাকিবে না, তাই প্রেমের ভিখারী গৌররূপধারী চৈতন্যদেব নবদ্বীপ আলো করিয়া প্রেমের পশারা মাথায় লইয়া বেদাদি শাস্ত্রার্ণবের নিগূঢ় গর্ভ-মন্থন পূর্ব্বক ভারতকে উচ্চৈঃস্বরে আশ্বাস দিয়াছিলেন, "ভয় নাই", কলির সমস্ত দোষ থাকিলেও ইহার একটি বিশেষ গুণ আছে ; বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতে পার আর নাই পার, হরিনাম করিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে, ভব-বন্ধন মোচন ও পরমপদ লাভ হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে, যথা,—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তিহ্যে কো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥
কলিং সভা জয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনে নৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥

পদ্য—

"জীবের উদ্ধার জন্য, নবদ্বীপে অবতীর্ণ,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার।
আবির্ভূত বিষ্ণু অংশে, জন্মিয়া ব্রাহ্মণ বংশে,
বৈষ্ণবত্ব করেন প্রচার ॥
কলিযুগে হিন্দু যত, কদাচারী পাপে রত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম না করে বিচার।

নাহি হয় বুদ্ধি শুদ্ধি, ভ্রমে করে পাপ বৃদ্ধি,
অধর্ম্মেতে মজিল সংসার ॥
জীবের দেখি দুর্গতি, শচীসুত শান্তমতি,
মহাপাপী উদ্ধার কারণ।
ছাড়ি মাতা বন্ধু জায়া, ত্যজি সংসারের মায়া,
করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ ॥
আদ্যাশক্তি রাধা সতী, শ্রীকৃষ্ণ গোলকপতি,
হৃদিপদ্মে করিয়া স্থাপন।
অন্য চিন্তা পরিহরি, শুদ্ধ চিন্তা প্যারী হরি,
যুগ্মতত্বে সদা মত্ত হন ॥
ভাবিয়া যুগল ভাব, উদ্ভবে অদ্বৈত ভাব,
ক্রমে হয় জ্ঞানোদয় তারী।
প্রকাশিয়া শাস্ত্র মত, দেখান সুগম পথ,
উদ্ধার করিতে পাপাচারী ॥

চৈতন্যদেব শ্রুতিসিদ্ধ "হরি" শব্দের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ধনী, মানী, মূর্খ, জ্ঞানী, পাষণ্ড মায়াবাদি-পণ্ডিত হইতে যবন পর্য্যন্ত, সকলেই চমকিত হইল, হরিনামে দেশ জাগিয়া উঠিল, লোকে মাতোয়ারা হইল। সহস্র সহস্র পাষণ্ডের হৃদয়ে ভক্তির বান ডাকিল,

"শ্রীরাই কিশোরীর প্রেম কে নিবিরে আয়।
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায় ॥"

চৈতন্যদেব ভক্ত সঙ্গে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, সহস্র সহস্র কর্ম্মী, জ্ঞানী, তত্ত্ববাদী পণ্ডিত, এবং পাষণ্ডদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন,

আবার সহস্র সহস্র যবনকেও ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। যবনদিগকে কি জন্য বৈষ্ণব করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এখন বলিব না। চৈতন্য চরিতামৃতে উক্ত আছে যে শ্রীরূপ এবং সনাতন গোস্বামীদ্বয় যবন ছিলেন। যথা,—

"তবে দবির খাস আইল আপনার ঘরে।"
"ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া।
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আসিলা প্রভুস্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাসসনে।
তারা দুই জন জানাইল প্রভুর গোচরে।
রূপসাকর মল্লিক আইল তোমা দেখিবারে।
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হইয়া।
দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল।
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি কহে কর যোড় করি।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
পতিত পাবন জয় জয় মহাশয়।
নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ।"
"মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধীচ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জামে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম!"

ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণ দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।
মোর ধর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয় বিষ্ঠা গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া।
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিত পাবন তুমি সবে তোমা বিনে।
আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ বল।
পতিত পাবন নাম তবে সে সফল।
সত্য এক বাত কহোঁ শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়।
মোরে দয়া করি কর সদয় সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া বল।
"শুনি মহা প্রভু কহে শুন দবির খাস্।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হইতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড়ি তোমার দৈন্যে কাটে মোর মন।
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বারবার।
সেই পত্রী দ্বারা জানি তোমার ব্যবহার।
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রদ্বারে।
তোমায় শিখাইতে শ্লোক কহিল বারে বারে।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোক্ত শ্লোকঃ—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহ কর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নব সঙ্গরসায়নং॥"

"এই মত দুই জন কৃষ্ণ কথা রঙ্গে।
সুখে কাল গোঁওয়ায় রূপ হরিদাস সঙ্গে।
চারি মাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ।
গোসাঁই বিদায় দিল গৌড়েতে গমন।
শ্রীরূপ প্রভু পদে নীলাদ্রি রহিলা।
দোলযাত্রা প্রভু সঙ্গে আনন্দে দেখিলা।
দোলযাত্রা বই প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা।
অনেক প্রসাদে করি শক্তি সঞ্চারিলা।
বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহিয়া বৃন্দাবনে।
একবার ইহা পাঠাইও সনাতনে।
ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত তীর্থ সব তার করিহ প্রচারণ।
কৃষ্ণ সেবা রসভক্তি করিহ প্রচার।
আমিহ দেখিতে তাহা যাব একবার।
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
রূপ গোসাঁই শিরে ধরে প্রভুর চরণ।"
"এই মতে সনাতন বৃন্দাবন আইলা।
পাছে আসি রূপ গোঁসাই তাহারে মিলিলা।
এক বৎসর রূপ গোঁসাই গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বে স্থিত অর্থ বিভাগ করি দিল।
গৌড়ে যে অর্থ ছিল তাহা আনাইল॥
কুটুম্ব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বাঁটি দিল।
সব মন কথা গোঁসাই করি নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত করিয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন॥

দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দুঁহে সব নির্ব্বাহিল॥
নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ততীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেবা প্রকাশ করিলা॥
সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে।
ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হইতে॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলারসপ্রেম যাহা হইতে জানি॥
হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহা না পাইয়ে পার॥
আর যত গ্রন্থ কৈল তাহা কে করে গণন।
মদন গোপাল গোবিন্দের সেবা প্রকাশন।"

এখন আমরা বুঝিলাম, পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী যবন ছিলেন, চৈতন্য দেবের কৃপায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, গোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আদেশ মতে বৃন্দাবনে গমন করিয়া, লুপ্ততীর্থ সকল প্রকাশিত করিলেন, কতশত বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন, শুভক্ষণে শ্রীমদন গোপাল এবং গোবিন্দ দেবের মূর্ত্তি স্থাপনা করিলেন, সেই দিন হইতে গোলোকধাম শূন্য করিয়া আবার যেন গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবন ধাম আলো করিয়া অবতীর্ণ হইলেন, তাই আনন্দে যমুনা তরঙ্গ রূপ বাহু সঞ্চালন ও কল কল নাদ পূর্ব্বক নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। পক্ষী সকল আবার হরিগুণ গান করিতে লাগিল, ভ্রমর সকল গুন্ গুন্ করিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল,

আবার হিন্দু সমাজ জাগিয়া উঠিল, চারিদিক্ হইতে সহস্র সহস্র সাধু, বৈষ্ণব, ব্রহ্মচারী ছুটিতে লাগিল, বৃন্দাবনে গিয়া তীর্থ সকল দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন, তাঁহাদের প্রেমাশ্রুধারায় ব্রজধাম ভাসিতে লাগিল। রসের ফোয়ারা ছুটিল, কত লোক স্নান করিয়া তাপিত দেহ শীতল করিল, কত শত রাজাধিরাজ, কত শত ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অভক্ত যবন স্ব স্ব ধর্ম্মত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে ছুটিলেন। কত লোক সংসারের সুখৈশ্বর্য্যকে পদাঘাত করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিল এবং বৈষ্ণবত্ব পালন করিয়া পরম পদ লাভ করিল। বৃন্দাবনে দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, কলহ নাই, শাস্ত্রের কুটিল তর্ক নাই, হরি হরি শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দই নাই, হরি কথা ভিন্ন আর কোন কথাই নাই, বৃন্দাবন আনন্দধাম হইল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই যবন প্রকাশিত তীর্থে গিয়া হিন্দু আজ পবিত্র হইল, জীবন সফল হইল, পতি পুত্রত্যাগ করিয়া কত সহস্র সহস্র কুলরমণী বৃন্দাবনে ছুটিল, বৃন্দাবনের রজে দেহ লুটাইয়া দেহ পবিত্র করিল, সমস্ত পাপ হইতে অব্যাহতি পাইল। বৃন্দাবনের মৃত্তিকাতে আজ হিন্দুর তিলকসেবা হয়, বৃন্দাবনের নামে হিন্দুর চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসিয়া যায়। আজ লালা বাবু অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে কেন? আজ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বৃন্দাবনে কেন? আজ সমগ্র হিন্দুমণ্ডলী বৃন্দাবনে কেন? বৃন্দাবনে দেহ ত্যাগ করিবার জন্য সহস্র সহস্র নরনারী মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছেন কেন? ধন্য চৈতন্য দেব! ধন্য মহাপ্রভু! ধন্য তোমার লীলা! শুভ-

ক্ষণে নবদ্বীপে ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইলে, শুভক্ষণে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিলে, কিন্তু তোমার লীলার গুপ্ত রহস্য আজ পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারে নাই কেন? সহস্র সহস্র যবনকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করাইলে কেন? যবনকেই আবার গোস্বামী উপাধি প্রদান করিলে কেন? তোমার কোটি কোটি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ভক্ত থাকিতেও কেবল রূপ-সনাতনকেই বৈষ্ণব তত্ত্বের গুহ্য উপদেশ দিলে কেন? আবার তাহাদিগকে বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ সকল এবং বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল প্রকাশ করিতে আদেশ করিলে কেন? তোমার তো আর্য্যশাস্ত্রজ্ঞ শিষ্যের অভাব ছিল না! এই সকল প্রশ্নের অর্থ আমাদিগকে কে বুঝাইয়া দিবে? তোমার লীলার প্রকৃত রহস্য কি, তাহা কে বুঝাইয়া দিবে? প্রকৃত বৈষ্ণব ভিন্ন কে বুঝাইতে পারে? কিন্তু আজ কাল তেমন বৈষ্ণব কৈ? তুমি যে সুর বাঁধিয়া গান জমাইয়া লোককে গাইতে বলিয়া গিয়াছ ভাঙ্গা আসরে তোমার সে সুর আজ বে-সুর হইয়াছে। হায়! আজ গোস্বামী বাবাজী, নেড়া নেড়ী, ইঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন! কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি কখনই তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলিবেন না। এই বৈষ্ণব নামধারী জীব বিশেষ এক অদ্ভুত পদার্থ। ইহারা হরিনামের বলে যথেচ্ছাচারী। অপকর্ম্ম যত প্রকার আছে ইহারা একচেটে করিয়া লইয়াছে। কাপট্য ইহাদের মূল মন্ত্র, স্ত্রীলোক ইহাদের পরমার্থ, কামশাস্ত্র ইহাদের মোক্ষ বিধাতা। হরিনাম ইহাদের হজ্‌মিগুলি। ইহারা সকল প্রকার পাপাচার করিতেছে কিন্তু "হরের্নামৈব

কেবলম্‌” বলিয়া আপনাদিগকে বে-কসুর খালাস বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। পিতৃহত্যা করিয়া পাপমোচনার্থে বলিতেছে “হরিবোল” গুরুপত্নীতে গমন করিয়া “হরিবোল” বলিয়া বাঁচিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। ভ্রূণ-হত্যা করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া, কুলরমণীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া, “হরিবোল” বলিয়া বাঁচিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে; ইহাদের পাপ-স্রোতে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে সে সকল স্পষ্ট করিয়া আর লিখিব না, লিখিলে লেখনী অপবিত্র হইবে। কিন্তু পাঠক মনে করিবেন না যে, বৈষ্ণব মাত্রেরই উপর এই তীব্র আক্রমণ করিলাম, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেক মহাত্মা সাধুপুরুষ আছেন, তাঁহাদের পরিচয় আমরা স্থানান্তরে দিব, তাঁহাদের কৃপাতেই আমরা চৈতন্যলীলার গুহ্য রহস্য প্রকাশ করিতেছি। প্রথমতঃ বৈষ্ণবগণেরপ্রধান বেদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। তাহাতে বৈষ্ণবের লক্ষণ কিরূপ লিখিত আছে দেখুন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্ত পদ্য—

“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥”
“তৃণ হইতে নীচ হইয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভৎর্সন তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেও তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয়॥

এইত বৈষ্ণব করে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক ফল খাবে॥
সদা নাম লবে যথা লাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করে ভক্তি ধর্ম্ম পোষ॥"
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন॥
কৃপালু অকৃত-দ্রোহ সত্যসার শম।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈক শরণ।
অকাম নিরীহ স্থির বিজিত ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অমানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি-দক্ষ মৌনী॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে—

"তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্ব দেহিনাং।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে—

"মহৎসেবা দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥"

অস্যার্থঃ।—মহৎ সেবা মুক্তির দ্বার হইতেছে। স্ত্রীসঙ্গ ও যে স্ত্রীসঙ্গ করে (বেশ্যাসক্ত) তাহার সঙ্গ এই দুই নরকের দ্বার স্বরূপ। যাহাদের উপভোগ্য বিষয় সকলের প্রাপ্তিতে ইচ্ছা নাই এবং অপ্রাপ্তিতেও দুঃখ নাই, তাঁহাদিগকে "সম-চিত্ত" কহে। শমগুণাবলম্বিগণকে প্রশান্ত কহে। যাঁহারা সমচিত্ত ও প্রশান্ত তাঁহারাই মহৎ লোক অর্থাৎ বৈষ্ণব।

এবং যাঁহারা পরোপকারী, সুহৃৎ ও ক্রোধশূন্য তাঁহারাই বৈষ্ণব।

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥
বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা যদি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করায় না করে প্রায়শ্চিত॥"

চৈতন্যদেব ছোট হরিদাসকে তাঁহার ভক্তবৃন্দ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন কেন পাঠক দেখুন।

"আজি হইতে এই আমার আজ্ঞা পালিবে।
ছোট হরিদাস ইহা আসিতে না দিবে॥
দ্বারমানা হরিদাস দুঃখী হইল মনে।
কি লাগিয়া দ্বারমানা কেহ নাহি জানে॥
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি সবে পুছিল প্রভুর পাশ॥
কোন অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বারমানা করে উপবাস॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥"

পাঠক! চৈতন্যচরিতামৃতের এই দুই চারিটী কথা শুনিয়া কি বুঝিলেন? বৈষ্ণবকে সেবাদাসী গ্রহণ করিতে হইবে,

এই রূপ বুঝিলেন? না জ্ঞান পূর্ব্বক যথেচ্ছা পাপ করিলেও মুখে "বোল হরি বোল" বলিলেই সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্ত হয় বুঝিলেন?

বৈষ্ণবগণের সেবাদাসী নহিলে রাস-লীলা হয় না, বস্ত্র-হরণ হয় না। (শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা এবং বস্ত্রহরণের অর্থ কপটবেশী বৈষ্ণব কি বুঝিবে?) কিন্তু গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে বলিলেই, গোস্বামী এবং বাবাজি মহাশয়গণ কোন্ দিকে পলায়ন করিবেন তাহার ঠিকানা নাই। সেবাদাসী সংগ্রহার্থে অনেক কুলে কালি দিয়া থাকেন। অনেকের কুলবধূ আজ কাল তাঁহাদের চরণ-ধূলি প্রসাদে পথের কাঙ্গালিনী। কিন্তু হায়! যিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি যুবতী ভার্য্যাকে অগ্রেই পরিত্যাগ করিয়া জগৎকে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। আজ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, পাপিষ্ঠগণ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে কিছু মাত্র লজ্জিত হয় না। হা ধর্ম্ম! তুমি কোথায়? ভারত আজ ধর্ম্মশূন্য হইয়াছে, তাই ক্রমশঃ ধর্ম্মবিপ্লব হইতেছে। যাহা হউক সেবাদাসী সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা আমরা বলিব ঃ— ভাগবতে। ১শে।

'দৃষ্টা স্ত্রিয়ং দেব মায়ায়াং তদ্ভাবৈ রজতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ প্রতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥
যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদি দ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূঢ়ঃ।
প্রলোভিতাত্মাহ্যপভোগ বুদ্ধ্যা পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ॥
কদাচিৎ যুবতীং ভিক্ষুর্নস্পৃশেদ্দারবীমপি।
স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ॥"

তাৎপর্য্য—পতঙ্গ সকল অগ্নিরূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া যেমন প্রাণত্যাগ করে, তদ্রূপ অজিতেন্দ্রিয় ভগবৎ মায়া স্বরূপা স্ত্রীরূপে ঝাঁপ দিয়া অন্ধতম নরকে পতিত হয়। স্ত্রী, স্বর্ণ, স্বর্ণাদি নির্ম্মিত আভরণ ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি উপভোগ্য বস্তু সকলে যে প্রলোভিত হয় সে বৈষ্ণব নহে, সে মূঢ়। অতএব ভিক্ষুক (বৈষ্ণব বা যতি) কাষ্ঠময়ী স্ত্রী প্রতিমাও পাদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না।

(দৃষ্টান্ত) আরণ্য হস্তী ধরিতে হইলে অগ্রে বনমধ্যে প্রকাণ্ড গর্ত্ত খনন করে। তৎপরে গ্রাম্য হস্তিনী লইয়া গিয়া আরণ্য হস্তীকে কোন কৌশলে স্পর্শ করায়। হস্তিনীকে হস্তিপক লইয়া আসিলে, হস্তিনী-স্পর্শ-বিমুগ্ধ আরণ্য হস্তী অজ্ঞান হইয়া হস্তিনীর পশ্চাৎ ধাবমান হইতে গিয়া সেই বনমধ্যবর্ত্তী গর্ত্তে পতিত হয়। পরে তাহাকে লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করে। এক্ষণে এই দৃষ্টান্ত দিতেছেন যে, যেমন হস্তিনী স্পর্শে হস্তীমুগ্ধ হইয়া তাহারই সচরাচর গম্যপথে গর্ত্ত রহিয়াছে দেখিতে পায় না, সহসা পতিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিগড় বদ্ধ হয়, বৈষ্ণবগণেরও স্ত্রীলোক সংস্পর্শে সেইরূপ গতি হয় জানিবে।

পদ্মপুরাণে যথা,—

"নপুংসকা যে যোষিৎসু তে জ্ঞেয়া বৈষ্ণবা জনাঃ।"

অর্থাৎ যাঁহারা যোষিৎগণ বিষয়ে নপুংসক হয় তাঁহারাই বৈষ্ণব। ধর্ম্মধ্বজী বৈষ্ণবেরা রসকলি (ছিটে ফোঁটা) কাটিয়া এবং কুঁড়োজালি হাতে লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এবং হরিনামের দোহাই দিয়া সকল প্রকার

পাপাচরণ করিয়া থাকেন এবং মুখে স্পষ্ট বলিয়া থাকেন যে, হরিনাম করিলে কোন পাপই স্পর্শ করিতে পারে না। আমরাও স্বীকার করি যে, হরিনামের মহিমায় সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, কিন্তু তেমন করিয়া হরিনাম করিতে কে পারে? কাল্‌নার ভক্ত চূড়ামণি নাম-ব্রহ্মবাদী ভগবান্ দাস বাবাজীকে আমরা দেখিয়াছি। তিনি বলিতেন যে, যেমন তেমন করিয়া অর্থাৎ "হেলায় বা শ্রদ্ধায় বা" হরিনাম করিলে যদি পাপের বীজ ধ্বংস হইত, তবে হরিনাম করিবার পর আবার পাপে মতি হয় কেন? তিনি বলিতেন কলুর ঘানি হইতে তৈল বাহির হইবার সময়, একটি ফোঁটা পড়িতে না পড়িতে নলের মুখে আর একটি তৈল বিন্দু আসিয়া যোগায়, সেইরূপ হরিনাম উচ্চারণে জিহ্বা যদি ক্ষণমাত্র বিরাম না পায়, তবেই জীব পাপ করিতে আর অবকাশ পায় না। যবন হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন বলিয়া সুন্দরী বেশ্যা মোহিনী মায়ায় আকর্ষণ করিতে পারে নাই, বরং তাহার দুর্ম্মতি ফিরিয়া গিয়া পরম বৈষ্ণবী হইয়াছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতে যথা—

"আর দিন রাত্রি হৈল বেশ্যা আইল।
হরিদাস বহুতারে আশ্বাস করিল॥
কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে মোর।
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার॥
যাবৎ ইহা বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হইলে পূর্ণ হবে তোমার মন॥

তুলসীকে তবে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি॥
রাত্রি শেষ হইল বেশ্যা উষি মিষি করে।
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে॥
কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি এক মাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল আসি শেষে॥
আজি সমস্ত হবেক হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না হৈল॥
কালি সমাপ্ত হবে তবে ব্রত ভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥
বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিল।
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঠাঞি আইল॥
তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি॥
নামপূর্ণ হবে আজ বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ॥
কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রী শেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥
দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে ঠাকুর চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে॥
বেশ্যা হয়ে মুই পাপ করেছি অপার।
কৃপা করি কর মো অধমে নিস্তার॥
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি॥

সেই দিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া॥
বেশ্যা কহে কৃপা করি কহ উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভবক্লেশ॥
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
এত বলি নাম তারে উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিল ঠাকুর বলি হরি হরি॥
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহবৃত্তি যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥
মাথামুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ।”

ধন্য হরিদাস ঠাকুর! শুভক্ষণে তুমি যবনত্ব পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলে, তোমাকে যাহারা যবন হরিদাস বলিয়া সম্বোধন করে তাহারা ঘোর পাতকী; তুমি আমাদের প্রণম্য। তোমার চরণে আমরা কোটি কোটি নমস্কার করি। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীনগ্রামে হরিদাস ঠাকুরের আখ্ড়া আছে। তাঁহার ভজন মন্দিরটি এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে, যিনি হরিদাসের আখ্ড়ায় গিয়া ধুলায় দেহ লুটাইতে পারিয়াছেন তিনিই ধন্য। হরি-

দাসের আখ্ড়ায় যাইলে মনে বিরাগ উপস্থিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। কেমন করিয়া হরিনাম করিতে হয়, পাঠক বোধ হয় এখন বেশ বুঝিলেন। হরিনামের মহিমা পাঠ করিলে আনন্দে হৃদয় উথোলিয়া উঠিবে। ভগবানের অতুল দয়া স্মরণ করিতে পারিলে প্রেমাশ্রুতে বক্ষ ভাসিয়া যাইবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী ও সর্ব্ব পাপনিরত ব্যক্তিও যদি হরিনাম করে, সেও পাপ হইতে মুক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, যথা, শ্রীবৈশম্পায়নে।—

"সর্ব্বধর্ম্ম বহির্ভূতঃ সর্ব্ব পাপরতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥

অজ্ঞান জন্য পাপাচরণ করিয়া তৎপ্রতিবিধান জন্য কোন উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না থাকিলেও নামের গুণে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজকাল গোস্বামী ও বৈষ্ণবদের মত জানিয়া শুনিয়া হরিনামের দোহাই দিয়া সংকল্পযুক্ত চিত্তে পাপ করিলে নিস্তার নাই। ভণ্ড বৈষ্ণবেরা মনে করে পরদারই করি কিম্বা চুরি ডাকাতিই করি, হরিনামের গুণে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইব, কিন্তু তাহা কখনই হইতে পারে না। যথা মৎস্য পুরাণে—

"পরদাররতো বাপি পরাপকৃতি কারকঃ।
স শুদ্ধো মুক্তি মাপ্নোতি হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥"

পাঠক এই শ্লোকের অর্থ কি বুঝিলেন! পরদার করিয়া আর পরাপকার সাধন করিয়াও "হরি বোল হরি বোল" বলিয়া আপনাকে "বেকসুর খালাস" মনে করিব? না

হরিনাম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যে কিছু পাপ অনুষ্ঠিত হউক না কেন, হরিনাম করিলেই সমস্ত পাপ বিদূরিত হইয়া চিত্ত শুদ্ধি হইবে? হরিনামের দোহাই দিয়া যাহারা পাপ করিয়া থাকে তাহাদিগকে যমালয়ে ঘোর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে যথা পাদ্মে—

"নাম্নো বলাদ্ যস্যহি পাপবুদ্ধি
ন বিদ্যতে তস্য যমৈ হি শুদ্ধি।"

এই সকল ধূর্ত্ত কপটবেশী বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবতত্ত্ব কিছু মাত্র জানে না তাই সর্ব্বদা পাপে নিরত থাকে। ইহারা বৈরাগী বলিয়া পরিচয় দিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না। পতিতপাবন গোস্বামীগণ সহস্র সহস্র হাড়ি, মুচী, জোলা ও চণ্ডালকে শিষ্য করিতেছেন, এই জন্য আলস্য পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বস্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সেবা দাসী সঙ্গে গৃহস্থের বাটী বাটী ভিক্ষা করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে উদর পোষণ করিতেছে, বেশ দশ টাকা হাতে জমাইতেছে, কোন ক্লেশ নাই, পরিশ্রম নাই, ধর্ম্মের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই, মনের সাধ মিটাইয়া পাপাচরণ করে, আর এক এক বার "হরি হরি বোল" বলিয়া থাকে। ধর্ম্মরাজ কৃতান্তদেব। নরক কি এত পূর্ণ হইয়াছে যে এই সকল গোস্বামী, বৈষ্ণব, নেড়া নেড়ীদের তথায় স্থান সঙ্কুলন হয় না? দেশে একটা কুলী, মজুর, কৃষাণ পাওয়া যায় না, কৃষিকার্য্য এক প্রকার বন্ধ হইতে চলিল, আর কিছু দিন পরে এক মুঠা অন্নও পাওয়া যাইবে না, একটা চাকর কি চাকরাণী পাওয়া যায় না, তজ্জন্য ভদ্রলোকের কতই কষ্ট হইতেছে, কিন্তু এদিকে কোটি

কোটি বাগ্দী, হাড়ি, মুচি বৈরাগী হইতেছে। কি আশ্চর্য্য ! পেটের দায়ে বৈরাগী হইতে পারে ভারতবাসীর পক্ষে আজ নূতন কথা। দরিদ্র কখনও ফকির হইতে পারে না, ফকির হইবে রাজা অধিরাজ, নচেৎ কাহার সাধ্য ? পাঠককে আমরা সহজেই বুঝাইব। শাস্ত্র বচন আবশ্যক নাই।

অগ্রে কর সুখ ভোগ পশ্চাতে বৈরাগ্য যোগ,
ভোগ বিনা মুক্তি কভু নয়।
সুখে বঞ্চিত যে জন, সদা তার ভোগে মন,
বৈরাগ্য তার কিরূপে হয় ॥
ভোগে সুখ অন্ত হয়, বৈরাগ্য তখন কয়,
দরিদ্রেতে না হয় বৈরাগী।
জঠর জ্বালার তরে, ভিক্ষাহেতু ভেক্ ধরে,
পেটের জ্বালায় সে বৈরাগী ॥
চিরদুঃখী যেই জন, ধনে জনে বিড়ম্বন,
সে জন কেমনে হয় ত্যাগী।
অতুল ঐশ্বর্য্য ধন, ত্যাগ করে যেই জন,
সেই হয় ত্যাগী মহাযোগী ॥

এই সকল কপটাচারী বৈষ্ণব উপাধিধারী দস্যুদিগকে কদাচ ভিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। শাস্ত্রানুসারে ইহারা দণ্ডনীয়। ইহারা প্রকৃত সাধুদিগের অন্নে ধূলি দিতেছে। ইহাদিগকে ভিক্ষা দিলে ঘোর পাতক ব্যতীত আর কিছুই হয় না, তাই আমরা বলি ইহাদিগকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে, কেননা দেশে শ্রমজীবি লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। হাড়ি, মুচি বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন

করুক ক্ষতি নাই, কিন্তু বৈষ্ণব হইলেই যে স্ব স্ব বৃত্তিত্যাগ করিতে হইবে, একথা কে বলিল? সমগ্র ভারতবাসী যদি বৈষ্ণব হইয়া ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করে তবে কে কাহাকে ভিক্ষা দিবে? মহাপ্রভুর এরূপ অভিপ্রায় কখনই ছিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, পাপাচরণ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন কর, নচেৎ কলির জীবের অন্য উপায় নাই (তাই তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন "হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা") সংসারের সমস্ত কার্য্য কর, কৃষি, বাণিজ্য, চাকুরি ইত্যাদি যাহা ইচ্ছা কর এবং সর্ব্বদাই হরিনাম কর. (কিন্তু গোস্বামী এবং বাবাজিদের মত হরিনামকে হজ্‌মিগুলি করিও না) সাধন ভজন কর, নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার কর, তাহা হইলে অবশ্যই জীবের সদ্গতি হইবে. সকলের অদৃষ্টে বৈরাগ্য উদয় হয় না, ভাগ্যক্রমে যখন যে মহাত্মার বৈরাগ্য হইবে, তখন তাঁহাকে গৃহকার্য্য করিতে কেহ অনুরোধ করিবে না—অনুরোধ করিলেই বা তখন শুনিবে কে? তখন তিনি ভগবানের প্রেম-সিন্ধুর অগাধ জলে ডুবিয়া যাইবেন। আর উঠিবেন না। তখন তিনি ঈশ্বরের সত্বা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর এমন কি নিজ দেহের সত্বা পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারিবেন না, তাঁহাকেই বৈরাগী কিম্বা বিবেকী বলা যায়। এরূপ বৈরাগ্য যদি এক জন হাড়ি কিম্বা চণ্ডালের হৃদয়ে উদিত হয় তবে তাঁহাকে জগৎ পাবন বলিয়া তাঁহার পাদপদ্মে আমরা নমস্কার করি, যথা—বরাহ পুরাণে—

"সংস্কৃতঃ কীৰ্ত্তিতো বাপি দৃষ্টঃ স্পৃষ্টোঽপিবা প্রিয়ে।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া।
এবং জ্ঞাত্বাতু বিদ্বদ্ভিঃ পূজনীয়ো জনার্দ্দনঃ।
বেদোক্তবিধিনা ভদ্রে! আগমোক্তেন বা পুনঃ॥"

প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইল, পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু মহাপ্রভুর অবসর লইবার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ উক্ত ধর্ম্মের অবনতি হইতেছে ইহার কারণ কি? ভারতের দুর্ভাগ্যই ইহার কারণ। বৈষ্ণবগণ যদি স্বধর্ম্ম পালন করিতেন, যদি মহাপ্রভুর অনুশাসন মানিতেন, যদি মহাপ্রভুকে মনে প্রাণে ভক্তি করিতেন, এবং সমাজে যদি তাঁহারা আদর্শ স্বরূপ হইতে পারিতেন তবে আজ সমগ্র ভারতবাসী বৈষ্ণবগণের পদাশ্রয় গ্রহণ করিতেন। আবার এদিকে বৈষ্ণবদিগের কুনীতি দেখিয়া ব্রাহ্মণ এবং উপাধিধারী ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ স্বার্থ সাধন জন্য শাস্ত্র বচন মান্য করেন না, বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহাদের বড়ই দ্বেষ, চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করেন, মহাপ্রভু অবতার ছিলেন না এক জন ভক্ত ছিলেন এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণ জন গণকে বুঝাইয়া দেন, তাহার কারণ আমরা স্পষ্ট বলিতে পারি যে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে আধুনিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাঁহাদের কুলগুরুগিরি, পুরোহিতগিরি, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগিরি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন হইবে না, তাই তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিন্দা করেন, এই জন্যই বৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে না। কিন্তু কলিতে বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম

পালন করা নিষেধ কিনা এবং মহাপ্রভু অবতার ছিলেন কিনা তাহা আমরা শাস্ত্রবচন দ্বারা বিশদরূপে প্রমাণ করিব যথা,—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাদশধ্যায়ে নবম শ্লোকে। নন্দংপ্রতি গর্গবাক্যং।

অসন্‌বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতো হ্যু যুগং তনুং।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

তথাহি মহাভারতে দানধর্ম্মে একোনপঞ্চাশদধিক দ্বিশতাধ্যায়ে সহস্রনাম্নি।—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃশান্তো নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ॥"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি সবি বাক্যং।—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপর্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ॥"

মুক্তি সঙ্কলিনী তন্ত্রে চতুর্থ পটলে—

"ভক্তরূপধরো ব্রহ্মচ্ছন্নত্বাৎ প্রকৃতেগু´ণৈঃ।
স্বয়ং ব্রহ্মচ ভক্তেহি মিতি বুদ্ধ্যাচ সাধয়েৎ॥"

সাধনোল্লাস তন্ত্রে—

"শচীসুতচ্ছলাৎকৃষ্ণঃ কলাববতরিষ্যতি।
যা কালী সৈব তারা স্যাৎ যা তারা ত্রিপুরা হি স১॥
ত্রিপুরা যা মহাদেবী সৈব রাধা ন সংশয়ঃ।
যা রাধা সৈব কৃষ্ণঃস্যাৎ যঃ কৃষ্ণঃ স শচীসুতঃ॥"

বিশ্বসার তন্ত্রে—

"গঙ্গায়া দক্ষিণেভাগে নবদ্বীপে মনোরমে।
কলিপাপ বিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনি॥
জনিষ্যামি প্রিয়ে মিশ্র পুরন্দর গৃহে স্বয়ং।
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ নিশায়াং গৌর বিগ্রহঃ॥"

শাক্ত এবং বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত সাধক তাঁহারা পরস্পর কখনও দ্বেষ করেন না বটে কিন্তু বৈষ্ণবের গোঁড়া এবং শাক্তের মদ্যপায়ীদিগের মধ্যে চির বিবাদ কখন মিটিল না। সাধন-উল্লাস তন্ত্রের উপরিউক্ত বচনটির অর্থ বুঝিয়াও যদি তাঁহারা পরস্পর নিন্দাবাদ করেন তাহা হইলে তাহাদিগকে নাস্তিক বই আর কি বলা যাইতে পারে?

৺ রাজা রাধাকান্ত দেব কৃত শব্দকল্পদ্রুম ধৃতানি অনন্ত সংহিতা বচনানি যথা, শ্রীভগবানুবাচ—

"অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজ গুণৈঃ সহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনী পরিবারিতে॥
অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন প্রকাশ্যং বহির্মুখে।
"ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং ভক্তং ভক্তিপ্রদং স্বয়ং।
মন্মায়ামোহিতাঃ কেচিন্ন জ্ঞাস্যন্তি বহির্মুখাঃ।
জ্ঞাস্যন্তি মদ্ভক্তিযুতাঃ সাধবোন্যাসিনোঽমলাঃ।
কৃষ্ণাবতারকালে যাঃ স্ত্রিয়ো বা পুরুষাঃ প্রিয়োঃ।
কলৌতেঽবতরিষ্যন্তি শ্রীদাম সুবলাদয়ঃ॥"

তথাহি বায়ুপুরাণে—

"দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥"

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ;—

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞে স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং॥"

"তথা হর্য্যাখ্যানোপনিষদি দ্বাপরান্তে নারদো ব্রাহ্মণং প্রতিজগাম কলিং পর্য্যটন্ কথং ভবরোগংসন্তরেয়ং। সহোবাচ সাধুস্পৃষ্টোঽস্মি। যৎসর্ব্বং শ্রুতিরহস্যং শৃণু। ভগবদাদি বিষ্ণোর্নারায়ণস্য নাম্নেতি। নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছেতি কিং নামেতি, সহোবাচ হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে ইতি ষোড়শকংনাম কলি কলুষনাশনং। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্বেষু বেদেষু দৃশ্যতে। তথা হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ইতি বারত্রয়মভিহিতং। অথ কলিযুগধর্ম্ম হরিনামৈব তদ্রক্ষকঃ শ্রীশচীনন্দন এব নান্য ইতি। তথা যুক্তিরপি শচীনন্দন এব কলিযুগাবতার ইতি জ্ঞাপয়তি।

আমরা ত অনেকগুলি শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম এবং ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নিশ্চয়ই অবতার ছিলেন। কেহ বলিতে পারেন যে, তন্ত্র মানি না, কিন্তু আমরা কেবল তন্ত্রশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করি নাই, তন্ত্রের প্রমাণই বা অগ্রাহ্য হইবে কেন? তন্ত্র কি শাস্ত্র নয়? যিনি প্রকৃত হিন্দু হইবেন তিনি বেদ, উপনিষৎ, মহাভারত, পুরাণ এবং তন্ত্র শাস্ত্রকে সমচক্ষে দেখিবেন, নচেৎ তিনি কথনই হিন্দু সন্তান নহেন। তন্ত্র সম্বন্ধে আমরা দুই একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

"আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তেনাগম ইতি স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ শিববক্ত্র হইতে আগত, গিরিজা মুখে গত এবং বাসুদেবের অভিমত, এই তিন কারণে, আগত, গত ও মত এই তিন শব্দের আদ্যক্ষর লইয়া তন্ত্র শাস্ত্রের নাম আগম হইয়াছে।

"নির্গতং গিরিজা বক্ত্রাদ্গতং শিবমুখেষু যৎ।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য নিগমস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ গিরিজামুখ হইতে নির্গত, মহেশ্বরের পঞ্চমুখে গত এবং বাসুদেবের সম্মত এস্থলেও নির্গত, গত ও মত এই শব্দত্রয়ের আদ্যক্ষর লইয়া নামান্তর নিগম।

ইদানীং দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে উপাসনার পঞ্চশাখার নিগূঢ় তত্ত্ব অতি অল্প লোকেই উপলব্ধি করিতে পারেন, সাধারণ জনগণ কোন তত্ত্বই জানেন না, তাই শাক্ত এবং বৈষ্ণবের বিবাদ মীমাংসা হয় না। কি আশ্চর্য্য! দেশ একবারেই উৎসন্ন গিয়াছে; হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্মচিন্তা নাই, তাই ধর্ম্ম লইয়া চিরবিচ্ছেদ মিটিল না। হিন্দু তোমার জীবনে ধিক্!

পঞ্চশাখার বিরোধের সামঞ্জস্যে মহিম্নঃ স্তবে পুষ্পদন্ত কি বলিয়াছেন, পাঠক দেখুন্।

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি মতং বৈষ্ণব মিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামার্ণব ইব॥"

অস্যার্থ—ত্রয়ী (বেদ) সাংখ্য, যোগ, পশুপতিমত (তন্ত্র

শাস্ত্র), বৈষ্ণব (নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্র) এই পরস্পর প্রভিন্নপথে রুচিভেদে "এইটি সুপথ, কি ঐটি সুপথ" ইহা লইয়াই যত কিছু মতামত, কিন্তু প্রভো ! সরল কুটিল নানা পথে ধাবিত নদ নদীর জল সকল যেমন পরিশেষে একমাত্র মহাসমুদ্রে গিয়া মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ সাধকগণ যিনি যে পথেই গমন করুন্ না কেন, পরিণামে একমাত্র অদ্বৈত সমুদ্ররূপ তোমাতেই গিয়া সকলে মিলিত হইবেন। পাঠক! বেদ বল, তন্ত্র বল, নিশ্চয় জানিও, ইহাই সকল শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং অর্জ্জুনং ভগবদ্বাক্যং—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

ইতি শ্রীমহাভারতান্তর্গত শ্রীভগবন্মুখপদ্ম বিনির্গত গীতা বচনাভ্যাং ইতি প্রতীয়তে যস্মিন্ সময়ে ধর্ম্মস্য গ্লানির— ধর্ম্মস্যপ্রভাবো ভবিষ্যতি তদা তদৈব যুগাবতারো ভবিষ্যামি ইতি শ্রীভগবতা প্রতিজ্ঞাকৃতা।

শ্রীভগবন্মুখপদ্মবিনির্গত গীতার মধ্যে শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যথা, যে কালে ধর্ম্মগ্লানি অর্থাৎ ধর্ম্মের নিন্দা হইবে অর্থাৎ ধর্ম্ম কেহ মানিবে না, অথবা ধর্ম্মপথানু- য়ায়ী মানবগণের অপমান হইবে এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান অর্থাৎ অধর্ম্ম পথাবলম্বী হইয়া জনগণ গো-বধাদি মহাপাতকে লিপ্ত হইবে, এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে

যত্ন করিবেন না সেই কালেই আমি অবতার হইব এই প্রতিজ্ঞা ভগবান্ করিয়াছিলেন এবং অবতীর্ণ হইয়া যে যে কার্য্য করিবেন তাহাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যথা, তৎকালে আমি অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণের ত্রাণ করিব, পাপ নাশ করিব, এবং পুনর্ব্বার সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিব এই বাক্যানুসারে এবং উপরিউক্ত শাস্ত্র বচনানুসারে বেশ প্রমাণ হইতেছে যে, চৈতন্যদেব অবতার ছিলেন। তবে বিতর্কবাদীর সমন্বয়ের পন্থা স্বতন্ত্র।

"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং।
এতৎ প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণং ॥"

সকলেই অবগত আছেন যে যখন ভারতবর্ষ যবনাক্রান্ত হইল, যবন রাজারা বেদোক্ত ধর্ম্মনাশের বহুতর চেষ্টা করিয়াছিল। এক হাতে "কোরাণ" ও অপর হস্তে তরবারি প্রদর্শন করিয়া বহুতর হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিল, সোমনাথ এবং বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উপর মস্জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কত সহস্র দেব দেবীর মন্দির এবং দেব দেবী ভগ্ন করিয়াছিল, এবং হিন্দু শাস্ত্র সকল ভস্মসাৎ করিয়াছিল ; এরূপ ধর্ম্ম-বিপ্লব আর কখনই হয় নাই। সেই সময় ক্ষত্রিয় সকল বীর্য্য হীন এবং অর্থহীন হইলেন, ব্রাহ্মণগণকে অর্থ দান করিতে পারিলেন না, সুতরাং ব্রাহ্মণের আর কোন উপায় থাকিল না, তখন ব্রাহ্মণকে দাসত্ব-লব্ধ অন্ন গ্রহণ করিতে হইল, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুশাসন পালন করিতে পারিলেন না। আমরা

ব্রাহ্মণ মহাশয়গণকে অযথা আক্রমণ করিয়াছি। ব্রাহ্মণের দোষ কি? হিন্দু রাজা না থাকিলে ব্রাহ্মণ রক্ষিত হইতে পারেন না। ঐ সময়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শিথিলতা দেখিয়া এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করা অসাধ্য মনে করিয়া, বহুতর লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক মুসলমান হইল, কত শত রাজা যবন-সম্রাটের অনুগ্রহের পাত্র হইবেন বলিয়া মুস্লেম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এতাদৃক্ ধর্ম্ম-গ্লানি তৎপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। সেই সময়েই ভগবানের অবতার হইবার প্রতিজ্ঞাত সময় উপস্থিত হইয়াছিল; তাই মহাপ্রভু সেই সময়েই অবতীর্ণ হইলেন, হিন্দুকে আশ্বাস দিলেন, "কলিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে না, তৎপরিবর্ত্তে হরিনাম গ্রহণ করিলেই সর্ব্বপাপের শান্তি হইবে।" তাই তিনি ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত জাতিবিচার না করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন, সহস্র সহস্র যবনকেও বৈষ্ণবত্ব প্রদান করিলেন, সেই সময় যদি মহাপ্রভু অবতীর্ণ না হইতেন, এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার না করিতেন তবে আজ হিন্দুকুলে বাতি দিতে কেহ থাকিত কি না সন্দেহ। আবার তিনি দিব্য চক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতে কেহই সক্ষম হইবে না, পালন করিলে পাপাচরণ ব্যতীত অন্য ফল হইবে না, ব্রাহ্মণের আচার থাকিবে না, যত প্রকার পাপাচার আছে ব্রাহ্মণই সমস্তগুলি একচেটে করিবেন, সনাতন ধর্ম্ম একবারে লুপ্ত হইবে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে (কুলীন ব্রাহ্মণের বহু বিবাহ জন্য বর্ণসঙ্করের অভাব নাই)

স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কত লোক খ্রীষ্টান্ হইবে, কত লোক যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্ম হইবে, কত লোক জাতি এবং ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বিলাতযাত্রা করিবেন, কত লোক বিলাতযাত্রা না করিয়াও ঘরে বসিয়া গোমাংস ভক্ষণ করিবেন (তবে তাঁহারা হিন্দু বলিয়া সমাজে পরিচিত আছেন, তাঁহাদের বড় একটা ভয় নাই, যাঁহারা বিলাত গিয়াছিলেন তাঁহারাই যেন চোরের দায়ে ধরা পড়িয়াছেন) সুতরাং জাতি বা ধর্ম্ম লোপ হইয়া যাইবে, সুদূরদর্শী মহাপ্রভু ভারতের কল্যাণ জন্য জাতি বিচার করেন নাই, তাই তিনি যবনকে বৈষ্ণবত্ব প্রদান করিয়া অগ্রেই দেখাইয়া গিয়াছেন যে, খ্রীষ্টান্ হউন্, ব্রাহ্ম হউন, বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তি হউন্, প্রচ্ছন্নভাবে কিম্বা প্রকাশ্যভাবে অখাদ্যভোজী হউন, অখাদ্য ভোজন পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন, তাই মহাপ্রভু সহস্র সহস্র যবনকে বৈষ্ণবত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, চৈতন্যচরিতামৃতে, যথা ;—

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেম ধন ॥
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নহে জাতি কুলাদি বিচার ॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥"

শ্রীমহাপ্রভুর কোটি কোটি ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ, সন্ন্যাসী শিষ্য ছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের মনে মনে হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণত্ব এবং পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল, তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহারা সূক্ষ্ম উপদেশ গ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন নাই, তাই মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে স্থূল স্থূল উপদেশ দিয়াছিলেন, অর্থাৎ কেবল হরিনাম গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। হরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইবে এবম্প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু রূপসনাতন যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অত্যন্ত হীনত্ব ও দৈন্যাতিশয্য বোধে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। পরন্তু ইহারা বাদশাহের উজীর ছিলেন, ইহারা যে প্রকারে উজীরত্ব এবং অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শরণাগত হইয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত চৈতন্যচরিতামৃতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদেরই তীব্র বৈরাগ্য হইয়াছিল, তাই মহাপ্রভু তাঁহাদিগকেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের অতীব সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এরূপ উপদেশ আর কেহই প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাই তাঁহারাই শ্রীবৃন্দাবন ধামের লুপ্ত তীর্থ সকল প্রকাশ করিতে এবং বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এই গুরুতর কার্য্য যবন কর্তৃক সমাধা করাইয়া মহাপ্রভু জগৎকে দেখাইলেন যে, কলিকালে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করা সহজ নহে, হরিনাম গ্রহণ করাই অনায়াসসাধ্য অথচ সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত। ধন্য মহাপ্রভু! তোমার লীলার রহস্য কে বুঝিবে? তুমি যথার্থই ভক্তাবতার রূপে

অবতীর্ণ হইয়াছিলে এবং কলির জীবের উদ্ধার হেতু যুগ ধর্ম্ম অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছ! সেই সময় হইতে লোকে যদি তোমার লীলার রহস্য বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে আজ হিন্দুসমাজের এতাদৃশী দুরবস্থা হইত না, হিন্দুসমাজ আজ নিৰ্জ্জীব হইত না, আধুনিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, হিন্দু আজ এরূপ কদাচারী, পাপাচারী ও ব্যভিচারী হইত না, আজ এত লোক খ্রীষ্টান্ এবং ব্রাহ্ম হইয়া সমাজচ্যুত হইত না, আজ কৃতবিদ্য লোক বিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে গিয়া সমাজ-পরিত্যক্ত হইত না, দেশের কৃত-বিদ্য লোকগুলি হাতছাড়া হইত না, এবং গৃহ-বিচ্ছেদও থাকিত না।

কালের দোষে কিম্বা কর্ম্মদোষে ইদানীং কায়স্থ এবং নবশাখ ভদ্র ভদ্র জাতি সকল শূদ্রবর্ণ হইয়াছে, অর্থাৎ কায়স্থ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত শূদ্রবর্ণ। কেহ কেহ ইহাদিগকে সৎ এবং অসৎ শূদ্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন কিন্তু অধমের সৎ বা অসৎ কি ? এই সকল শূদ্রবর্ণের কোন ধর্ম্মে অধিকার নাই, কেবল দ্বিজাতির শুশ্রূষা করাই ইহাদের মোক্ষধর্ম্ম। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন, শূদ্রও তাহার ফলভাগী হইবে, কিন্তু এখনত ব্রাহ্মণের বৈদিক যজ্ঞ নাই, আছে কেবল পাপাচার যজ্ঞ, সুতরাং শূদ্রজাতিকেও এখন এই যজ্ঞের ফলভাগী হইতে হইবে নচেৎ শাস্ত্র মিথ্যা হইবে। তাই মহাপ্রভু দিব্য চক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, যে নরকে কুলগুরু সেই নরকেই শিষ্য, যে নরকে পুরোহিত সেই নরকেই যজমান, এবং যে নরকে কলির ব্রাহ্মণ,

সেই নরকেই শূদ্র গিয়া অনন্ত কাল বাস করিবেন (তবে নরকে স্থান সঙ্কুলান হইবে কিনা সন্দেহ) তাই তিনি জীবের কল্যাণের জন্য "হরের্নামৈব কেবলম্" ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। অনাচারী ব্রাহ্মণগণ কখনও শ্রেষ্ঠত্ব পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, কিন্তু শূদ্রদিগের মতি গতি কি? তাহারা কাহার দোহাই দিয়া পরিত্রাণ পাইবে? তাহাদের পক্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভণ্ডামিটি পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য, কেননা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিলে পাপাচার ব্যতীত আর কোন ফল নাই। সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত অবতার ভগবান্ চৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ যুগধর্ম্ম ব্যতীত কলির জীবের নিস্তারের উপায় নাই তাহা আমরা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছি। যদি মানবজীবন সফল করিতে হয়, যদি পরম পদ লাভ করিতে হয়, তবে যে সমাজে কায়স্থ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত এক জাতি বা বর্ণ, যে সমাজে অখাদ্য ভোজী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিলে ঘোর পাপাচার হয়, সে সমাজে এবং সে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া শূদ্র জাতির বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য, যথা পদ্ম পুরাণে—

"অদীক্ষিতস্য বামোরু! কৃতং সর্ব্বমনর্থকং।
পশু-যোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাহীনোনরোমৃতঃ॥
বিনা শ্রী বৈষ্ণবীং দীক্ষাং প্রসাদং শ্রীগুরোর্ব্বিনা।
বিনা শ্রী বৈষ্ণবং ধর্ম্মং কথং ভাগবতো ভবেৎ॥"

রুদ্র যামলে—

"গুরু ভক্ত্যাচ শক্রত্বং মদ্ভক্ত্যা শূকরোভবেৎ।
গুরু ভক্তেঃ পরং নাস্তি সর্ব্বশাস্ত্রেষু তত্ত্বতঃ।"

অর্থাৎ গুরুভক্তির দ্বারা জীব ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে। কিন্তু আমার ভক্তি দ্বারা শূকর হইবে। অর্থাৎ জীব যদি গুরুতে অভক্তি করিয়া কেবল ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তি করে তবে শূকরত্ব লাভ হইবে। স্বরূপতঃ স্বর্ব্ব শাস্ত্রে গুরুভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর নাই।

যাঁহারা ভণ্ড হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা কি বলিব? বলিলেই বা শুনিবে কে? যদি ঐহিক ও পারত্রিক সুখে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা না হয়, তবে তাঁহারা খ্রীষ্টান্ হউন, সমাজচ্যুত হউন, বিলাত প্রত্যাগত হউন, অখাদ্য ভোজন পরিত্যাগ করিয়া সকলেই মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারেন। একথা আমরা বলিতেছি না, ইহাই মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য।

ভারতের ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গলের জন্যই, মহাপ্রভু বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই পবিত্র ধর্ম্মে জাত্যভিমান নাই, কৌলীন্য নাই, উপাসনার পঞ্চশাখার চিরবিচ্ছেদ নাই। (এইগুলি আমাদের দেশে গৃহবিচ্ছেদের মূলকারণ, সেই জন্যই দেশ উৎসন্ন গিয়াছে) বহু বিবাহ জন্য ব্যভিচার নাই, গণ পণ নাই, শুক্র বিক্রয় জন্য পাপাচার নাই, কন্যার বিবাহে ঋণ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় না, বারইয়ারি এবং প্রতিমা পূজা করিয়া দেবদেবীর অবমাননা জন্য পাপাচার হয় না, কলহ নাই, দ্বেষ নাই, বাল্যবিবাহ নাই। আজ ব্রাহ্মণ, হিন্দু, অহিন্দু, খ্রীষ্টান্ সমাজচ্যুত

ব্যক্তি, অধম শূদ্রজাতি সকলেই যদি বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে আবার ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইবে, গৃহবিচ্ছেদ থাকিবে না, সকলেই এক মন এক প্রাণ হইবেন, স্বজাতিপ্রিয়তা ভারতের ভাগ্যে কখনই নাই—স্বজাতিপ্রিয়তা স্থাপন করাই মহাপ্রভুর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাই তিনি জাতি বিচার করেন নাই, তাই তিনি যবনকেও বৈষ্ণবত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। স্বজাতিপ্রিয়তা নাই বলিয়াই ত যৌথ ব্যবসায় ভারতবাসীর অদৃষ্টে নাই, তাই আজ ভারত অর্থশূন্য, ভারতবাসীর দাসত্ব-লব্ধ অন্ন ব্যতীত জীবন ধারণের উপায় নাই, (বরং নরকেও বাস করা শ্রেয়ঃ, ইহ-জীবনে চাকুরী করা উচিত নহে) আবার সকলের ভাগ্যে চাকুরীও জুটে না, তাই আজ কোটি কোটি লোক অনাহারে জীবন পরিত্যাগ করিতেছে, চারি দিকে "হা অন্ন" রব উঠিয়াছে, ভারতে অন্ন-চিন্তা ব্যতীত আর অন্য চিন্তা নাই।

দরিদ্র হইলেই ক্ষুধানল সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, তাই দরিদ্র ভারতবাসী আজ সর্ব্বভুক্ হইয়াছে, ভারত-বাসী যেন কত সহস্র বৎসর ভোজন করে নাই, তাই আজ ক্ষুধার জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া কুপথ্য প্রিয় রোগীর ন্যায় খাদ্যা-খাদ্য বিচার করে না। গো এবং শূকরের চর্ব্বি মিশ্রিত ঘৃতের পুতিগন্ধি, কলের চিনি, বাজারের হোটেলের অন্ন, যবনস্পৃষ্ট-মিষ্টান্ন আজ নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর বড়ই রুচিকর হইয়াছে, আবার সেই বীরপুরুষদিগের সেবনীয় ব্রাণ্ডী এবং তাহাদের ভোজনীয় গোমাংস, মটনচপ, মোরগের কট্‌লেট্, ইংরাজে হোটেলে ইংরাজের পাত্রোচ্ছিষ্ট মাংস

ভোজন করিয়া হিন্দু বড়ই আনন্দ লাভ করিতেছে, তবে দুঃখের কথা এই যে, হিন্দু আজ জাতি, সমাজ এবং ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল, পিতামাতা ভ্রাতা ত্যাগ করিল, মাতৃভাষা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইল, অবশেষে বস্ত্রখানিও ত্যাগ করিয়া দিগম্বর হইল। তখন ইংরাজের পোশাক পরিধান পূর্ব্বক ইংরাজের খানা ভোজন করিয়া গ্রেট্ ব্রিটন দ্বীপের গৌরাঙ্গের পদাশ্রয় প্রার্থনা করিল, কিন্তু হায়! তথাপি তাঁহার দয়াত হইল না, এমন কি এই সর্ব্ব-ত্যাগী হিন্দুর স্পৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ইংরাজ কখনও গ্রহণ করেন না। হিন্দু যদি এরূপ সর্ব্বত্যাগী হইয়া আমাদের নব-দ্বীপের গৌরাঙ্গের পদাশ্রয় লইত, তবে পরম সুখী হইতে পারিত, মানবজীবন সফল হইত, এমন কি মোক্ষফল পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইত। পরন্তু এই সকল অখাদ্য, দুর্ব্বল পাকস্থলীতে কখনই পরিপাক হইবার যোগ্য নহে (কুকুরের পেটে ঘৃত কখ-নও হজম হয় না) তাই দেশে এত নূতন নূতন রোগের আবি-র্ভাব হইয়াছে, তাই আয়ু ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে, এবং অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে, কিন্তু হিন্দুর চৈতন্য নাই, দরিদ্রতার লক্ষণই এই। দরিদ্রতার সঙ্গে সঙ্গে বিলাসপ্রিয়তার বড়ই প্রাবল্য হইয়া থাকে, তাই হিন্দুর সখের প্রাণ হইয়াছে। বিলাতি আপাত রমণীয় জিনিস দেখিলে বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন না, দেশজাত কত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য আছে কিন্তু সেগুলি ব্যবহার করিলে কেহ যেন সভ্য বলিবে না। হিন্দুর ঘরে অন্ন নাই, তাই দাসত্ব-লব্ধ অন্নের জন্য ইংরাজের দ্বার হইতে দেশীয়

কুকুরের ন্যায় তাড়িত হইতেছে কিন্তু তথাপি কেশগুলি ফিরাসি করা চাই, পোশাকের চটক্ চাই, গিল্টী করা চেইন্ চাই। আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি কয়েকটি সভ্য বাবুর সঙ্গে এক জন কাবুলদেশীয় দোকানদারের বাগ্-বিতণ্ডা হইতেছিল, সেই সময়ে সেই পার্ব্বত্যদেশীয় অসভ্য জাতি দর্প করিয়া বলিল, "হাম্‌লোগ্ বাঙ্গালিকা মাফেক্ দশ রোপেয়াকা ওয়াস্তে জুত্তি নাহি খাতা হ্যায়্"। কি লজ্জার কথা! কেরোসিন্ তৈলের দুর্গন্ধে মস্তিষ্ক-গ্লানি হইয়া পীড়া হইতেছে, কত দুর্ঘটনা হইতেছে, চিম্‌নির আলোকে চক্ষুর তেজঃ বিনষ্ট হইতেছে কিন্তু হইলে কি হইবে? হিন্দু আজ সখের দাস হইয়াছে। রংচঙ্গে একখানি বিলাতি র‍্যাপার গাত্রে না দিলে আর ভদ্রলোক হওয়া যায় না, ইহাতে তুলা বা পশম নাই, আছে কেবল পাট আর হিন্দুর মাথা আর মুণ্ড। শীতে হৃদয় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, তজ্জন্য পীড়া হইতেছে, আয়ুঃক্ষয় হইতেছে, কিন্তু জীবন যায় যাউক, হিন্দু আজ বিলাসিতা দেবীর উপাসক হইয়াছে, সুতরাং তিনিই অপদার্থ হিন্দুর দেহের মুক্তিপ্রদায়িনী অথবা আমরা বলি অকাল মৃত্যু বিধায়িনী। দরিদ্র হইলেই দুর্ব্বলতার আধিক্য হইয়া থাকে এবং ঐশিক নিয়মানুসারে বীর্য্যধারণ করিতে দুর্ব্বল জীব কখনই সক্ষম হয় না (সিংহ এবং ব্যাঘ্র অতীব বলবান্ পশু বলিয়া তাহাদের প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসর অন্তর সন্তান উৎপন্ন হয়) তাই বাঙ্গালির ঘরে পালে পালে সন্তান জন্মিতেছে, অনেক স্থলে প্রত্যেক নব বৎসরে একটি করিয়া সন্তান উৎপন্ন হইতেও সচরাচর দৃষ্ট হইতেছে, তাই

দেশে এত সংক্রামক পীড়া এবং অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে। আবার দুর্ব্বলতার আর একটি প্রধান দোষ আছে, (দুর্ব্বল হইলেই কুপথ্য এবং বিলাসিতার দিকে মানুষের মন সর্ব্বদা ধাবমান হয়) দুর্ব্বলতা জন্য চিত্ত কখনই স্থির হয় না, সুতরাং ঈশ্বরোপাসনা মনে কখন স্থান পায় না, তাই দেশে আর ধর্ম্মালোচনা নাই, তাই ভারত ধর্ম্মশূন্য হইয়াছে। আমরা মনদুঃখে অনেকগুলি কথা বলিয়া ফেলিলাম, পাঠক! ক্ষমা করিবেন। যাহা হউক মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম যদি আমরা সকলে এখনও অবলম্বন করিতে পারি তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গল হইবে তাহার সন্দেহ নাই। স্বজাতিপ্রিয়তাই দেশের উন্নতি এবং ঐহিক মঙ্গল সাধনের এক মাত্র উপায়, এই মহামন্ত্রে যদি আমরা দীক্ষিত হইতে পারি তাহা হইলেই ভারতে অন্ন চিন্তা দূরীভূত হইবে, কিন্তু স্বজাতিপ্রিয়তা স্থাপনা করিতে হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই, এই পবিত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ভারতে আবার অর্থাগম হইবে, কেননা ভারতবাসী যৌথ ব্যবসায় করিতে শিক্ষা করিবে, দরিদ্রতা আর থাকিবে না, ধর্ম্মচিন্তার বাধক দাসত্ব-লব্ধ অন্ন হিন্দু আর স্পর্শ করিবে না, ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তি হইবে, বিলাসিতা স্বদেশে গমন করিবে, দেশে আবার লক্ষ্মীর কৃপা হইবে, জাতি বিচার থাকিবে না, সুতরাং দেশে বিদেশে বাণিজ্য ব্যবসায় করা চলিবে, গৃহ বিচ্ছেদ, দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা আর থাকিবে না, ভারত আনন্দধাম হইবে। "হরি হরি বোল" শব্দে সংক্রামক পীড়া প্রস্থান

করিবে, হিন্দুর শুষ্ক এবং মলিন বদন তখন প্রফুল্ল হইবে, অস্থিচর্ম্মসার দেহে তখন বল বীর্য্য সঞ্চারিত হইবে তাহা হইলে ধর্ম্ম চিন্তা করিবার যোগ্যতা হইবে, পাপাচার কদাচার, ব্যভিচার ভারতে আর স্থান পাইবে না—এই জন্যই মহাপ্রভু ভারতের কল্যাণ জন্য পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং ইহাই তাঁহার লীলার প্রথম অর্থাৎ ভারতের ঐহিক সুখ সম্বন্ধে গুপ্তরহস্য।

মহাপ্রভু শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীকে যে সকল সূক্ষ্ম এবং গুপ্ততত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তাহাতে ভারতের পারত্রিক সুখ সম্বন্ধে তাঁহার গুপ্ত রহস্য কি আমরা সাধু বৈষ্ণবের কৃপায় আলোচনা করিব। এই সকল বৈষ্ণবই আত্মজ্ঞানী, মহাযোগী এবং সিদ্ধ পুরুষ, ইহাঁরা কৌপীন এবং বহির্বাসধারী, ইহাঁদের গাত্রে আল্‌খাল্লা থাকে, হস্তে করোয়া থাকে, ইহাঁদিগকে দরবেশী বলে, ইহাঁদের সেবাদাসী নাই, ইহাঁরা বড়ই সংযমী এবং ঊর্দ্ধরেতাঃ. ইহাঁদের গাত্রে ছিটে ফোঁটা নাই, কণ্ঠি নাই, নাসিকাতে রসকলি নাই। ইহাঁরাই শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীর সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই প্রেমভক্তি, ভক্তিতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ইহাঁরাই আলোচনা করেন, অন্য বৈষ্ণবের পক্ষে এই সকল গুহ্যতত্ত্ব বড়ই সুদুর্ল্লভ। ইহাঁদের একটি গীত আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"রসনায় যে রস পাবে না। নামামৃত আজব কারখানা।
ধরতে আসল ধরে নকল, ঢেঁকীর মুষল ফসল চিনে না॥
আশীলাখবার এসে ভবে, সে সুধা না খেতে পাবে,
যেমন ক্ষুধা তেম্‌নি রবে, সার হবে ধান চিটে ভানা॥

রসনায় কৃষ্ণনাম তেমন, ওলার খোলায় দর্ব্বী যেমন,
নিয়ত তায় করে ভ্রমণ, আস্বাদন কিছুই জানে না।
ঝুলি ভরে হরিনাম করে, মর্‌বি কলুর বলদ ঘুরে,
চিন্‌তে নার্‌বি পরাৎপরে, মূলাধারে হয়ে কাণা॥"

শ্রীরূপের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ, যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবততত্ত্ব॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা॥"
"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণপ্রসাদে পায়ে ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হয়ে করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদী যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদী পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহা বিস্তারিত হয়ে ফলে প্রেম ফল।
ইহা মালী সেচে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুষ্ক যায় পাতা॥

তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তিমুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব হিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি উপশাখা গণ॥
সেক জল পেয়ে উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হয়ে মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমে উপশাখা করায় ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন।
প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাহা সেই কল্পবৃক্ষ করয়ে সেবন।
সুখে প্রেম ফল রস করে আস্বাদন॥"

অর্থাৎ এক একটি মানব দেহ এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। এই বিশাল বাহ্য জগৎ যে যে পদার্থে রচিত, মানব দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডও ঠিক সেই সেই পদার্থে বিনির্ম্মিত। বিশাল বাহ্য জগৎ যে যে পদার্থে পরিপূর্ণ, দেহ জগৎও সেই রূপ নদ নদী, দেব দেবী প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম পদার্থে পরিপূর্ণ। আর এই বহির্জগতে যে রূপ স্থানে স্থানে মহাতীর্থ বিরাজিত, অন্তর্জগতেও সেইরূপ মহাতীর্থ আছে। আধার চক্র হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত যে ছয়টী চক্র আছে উহা সমস্তই মহাতীর্থ রূপে পরিগণিত। এই সকল মহাতীর্থে মহাশক্তিরূপিণী শিবসীমন্তিনী নানা রূপে সাধকের অভীষ্ট

সাধন করিতেছেন। এই সমস্ত তীর্থের সুধা সলিলে অবগাহন করিতে পারিলে, আর বাহিরের তীর্থ অনুসন্ধান করিতে হয় না। তাই আত্মদর্শী যোগিগণ আত্মতীর্থে আত্মসমর্পণ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তাই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন জননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা, ভক্তিশ্রদ্ধাগয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যান-যুক্তঃ প্রয়াগঃ। বিশ্বেশোহয়ং তুরীয়ঃ সকল জনমনঃ সাক্ষিভূতোহন্তরাত্মা। দেহে সর্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি পুন-স্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি॥"

জীবাত্মা তিন প্রকার শরীরে অবস্থান করিয়া আসিতেছেন। ঐ তিন প্রকার শরীরের নাম স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থূল শরীর পঞ্চভূত দ্বারা বিনির্ম্মিত, সূক্ষ্ম শরীর মনঃ প্রাণ প্রভৃতি কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শক্তি সমষ্টি দ্বারা বিরচিত, আর কারণ শরীর অবিদ্যাময়ী মায়া দ্বারা গঠিত, জ্ঞানিগণ এই তিনটি শরীরকে জীবের তিন খানি পুর (পুরী) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যতদিন জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর রূপ পুরীত্রয়ের বিনাশ না হইবে, তত দিন জীব কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে পরমাত্মরূপী বিশ্বেশ্বর উক্ত পুরত্রয় বিনষ্ট করেন বলিয়া ত্রিপুরারি নাম ধারণ করিয়াছেন। অন্তরস্থ এই ত্রিপুরারিকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা অবলোকন করিয়া কত যোগী মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আবার পুরাণে লিখিত আছে "রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" রথে বামন দর্শন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহার অর্থ বাহিরের

রথ এবং বাহিরের বামন নহে। আবার গুরুগীতায় উক্ত আছে, "হৃদয়াকাশ মধ্যস্থং শুদ্ধস্ফটিক সন্নিভং। অঙ্গুষ্ঠ মাত্রং পুরুষং ধ্যায়েত চিন্ময়ং হৃদি॥" যিনি অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ খর্ব্ব তিনিই বামন। এই বামনের অপর নাম পুরুষোত্তম, যিনি এই দেহরূপ পুরীতে নিয়ত বাস করিতেছেন, তাঁহার নাম পুরুষ (অর্থাৎ পুরে শেতে ইতি পুরুষঃ। আবার এই বামনের আর একটী নাম হৃষীকেশ অর্থাৎ যিনি আছেন বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য করিতে সক্ষম, যাঁহার সত্ত্বা অবলম্বন না করিয়া ইন্দ্রিয়গণ কোন কার্য্য করিতে পারে না। যিনি ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়রূপে দেহ ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করিতেছেন তাঁহার নাম হৃষীকেশ। এই অন্তরাত্ম-রূপী বামন অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষকে (তিনি কেবল অন্তরের দেবতা নহেন, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন) যথা—"উত্তর গীতায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে সর্ব্বত্রাবস্থিতং শান্তং ন প্রপশ্যেজ্জনার্দ্দনং। জ্ঞানচক্ষুর্বিহীনত্বাদন্ধঃ সূর্য্যমিবোদিতং॥" যিনি দেহ-রথে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা অবলোকন করিতে সক্ষম, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। এই জন্যই পুরাণে বলিয়াছে "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" নচেৎ বাহিরের কাষ্ঠময় রথে কাষ্ঠময় জগন্নাথ দর্শন করিলে কথনই মুক্তিলাভ হইতে পারে না। মৃগ জানে না যে, তাহার স্বীয় নাভিমূলেই সৌরভ-শালিনী কস্তূরী বিদ্যমান আছে, তাই সে কস্তূরী সৌরভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায়। অজ্ঞানান্ধ জীবও সেইরূপ জানে না যে, তাহার দেহতীর্থে ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন, তাই সে আত্ম-

তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের তীর্থে ছুটাছুটী করিতেছে। যথা, জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্রে—

"মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ইদং তীর্থ মিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ॥"
"আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষো বরাননে।"
"দেহস্থাঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চ দেহাস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
দেহাস্থাঃ সর্ব্ব তীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে॥"

সুতরাং এই বামন অর্থাৎ বিশ্বেশ্বরের সাক্ষাৎকার ব্যতীত জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু এই বামনের সাক্ষাৎকার হইবার উপায় কি? (কেবল হরিনাম করিলে হয় না) তাই মহাপ্রভু শ্রীরূপকে উপদেশ দিলেন যে, ভাগ্যবান জীব গুরুকৃষ্ণ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর প্রসাদে উপদিষ্ট হইয়া মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীকে অর্থাৎ "ভক্তিলতা" ধ্যান করিবেন. তখন ঐ লতা, সাধন বলে (এখানে আধুনিক তান্ত্রিকের লতা-সাধন কিম্বা বৈষ্ণবের সেবাদাসী-সাধন নহে), স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে. থাকিলে, (এই সময়ে সাধক মধুরধ্বনি) তাই চৈতন্য চরিতামৃতে বলিয়াছেন, যথা—বংশীস্বরাদি উদ্দীপন কৃষ্ণাদি আলম্বন অনুভব করিবেন, প্রত্যেক চক্র ভ্রমণ করিয়া সহস্রদল কমলে উপস্থিত হইবেন, যাহার উর্দ্ধে মহাদেব বিরাজ করিতেছেন এবং যোগিবৃন্দকে নিয়ত সুধাদান করিতেছেন—এই স্থানকে শৈবগণ শিবস্থান কহেন, বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুধাম, এবং শাক্তেরা দেবী স্থান বলেন অর্থাৎ আপন আপন ইষ্টদেবতাকে ব্রহ্ম-স্বরূপে স্বীকার করেন, সুতরাং ঐ পরম শূন্যস্থান যে,

সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মস্থান, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। এই স্থানে উপাসনার পঞ্চশাখার দ্বন্দ্বযুদ্ধ নাই। এই স্থান হইতে ভগবান্ নিয়ত অমৃত দান করিতেছেন। অজ্ঞানান্ধ জীবকে বঞ্চিত করিয়া কুণ্ডলিনী বদন ব্যাদান পূর্ব্বক ব্রহ্মনাড়ীর অমৃতক্ষরণ দ্বার আচ্ছাদন করতঃ স্বয়ং সেই অমৃত পান করিতেছেন। কিন্তু সাধক যখন উগ্র সাধন দ্বারা কুণ্ড-লিনীকে অবলম্বন করিয়া ঐ স্থানে যাইতে পারিবেন অর্থাৎ ঐ স্থান ধ্যান করিতে সক্ষম হইবেন। তখন তাঁহার তালুমূলস্থ জিহ্বার অগ্রভাগে ঐ অমৃত ক্ষরণ হইতে থাকিবে, তখন সাধক অমৃত পান করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া অতুল আনন্দভোগ করিতে থাকিবেন। তাই ভগবান্ মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বলিলেন, "উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ডভেদী যায়, বিরজা ব্রহ্মলোকভেদী পরব্যোম পায়। তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥" (অর্থাৎ উপরি উক্ত ব্রহ্মস্থান, কিম্বা বিষ্ণুধাম, যেখানে ত্রিপুরারি, হৃষীকেশ বা পুরুষোত্তম বিরাজ করিতেছেন) তন্ত্র বলিতেছেন যথা,—"কায়োর্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকঃ স্বধঃ পাতালমেবচ। উর্দ্ধমূলমধঃ সাগ্রং বৃক্ষাকারং কলে-বরং।" অর্থাৎ সাধক উগ্র সাধনায় "লতা" কুণ্ডলিনী মূলাধার পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মস্থানে গমন করেন, তাই মহা-প্রভু বলিলেন "তবে মূল শাখা (কুণ্ডলিনী) বাড়ি যায় বৃন্দা-বন" অর্থাৎ দেহস্থ তীর্থ গমন করিয়া প্রেমের আস্বাদন গ্রহণ করিতে পারেন, তাই "প্রেমফল পাকি পড়ে মালী (সাধক) আস্বাদয়"। লতা অবলম্বি মালী "কল্পবৃক্ষ পায়"

(সহস্রদলপদ্ম) তাহা সেই কল্পবৃক্ষ করয়ে সেবন, সুখে প্রেম ফলরস করে আস্বাদন।" অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্থান হইতে যে অমৃত ক্ষরণ হইতেছে সেই অমৃত তখন সাধক পান করিয়া অতুল আনন্দভোগ করিবেন। কিন্তু আবার মহাপ্রভু বলিলেন "যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুষ্ক যায় পাতা॥" অর্থাৎ যদি সাধন সময়ে ইন্দ্রিয় সংযম না থাকে তবে হস্তিরূপ ইন্দ্রিয়গণ সমস্ত সাধন বিনষ্ট করিবেক। আবার বলিলেন, "যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা। ভুক্তিমুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥ নিষিদ্ধাচার কুটি নাটি জীব হিংসন। লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ॥" এই সকল হৃদয় হইতে দূরীকরণ করিয়া অগ্রে চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে, নচেৎ সাধন হইবে না, তাই শ্রীরূপকে সতর্ক করিলেন।

স্বয়ং নারদ পঞ্চরাত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যথা—

"মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপুরমনাহতং।
বিশুদ্ধঞ্চ তথাজ্ঞাখ্যং ষট্ চক্রঞ্চ বিভাব্যচ।
কুণ্ডলিন্যা স্ব শক্ত্যাচ সহিতং পরমেশ্বরং॥
সহস্রদল পদ্মস্থং হৃদয়ে স্বাত্মনঃ প্রভুং।
দদর্শ দ্বিভুজং কৃষ্ণং পীত কৌশেয় বাসসং।
সস্মিতং সুন্দরং শুদ্ধং নবীন জলদ-প্রভং।"

অর্থাৎ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ আজ্ঞাখ্য এই ষট্চক্র বিভাবন পূর্ব্বক হৃদয়ে সহস্রদলপদ্ম স্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি বেষ্টিত, সস্মিত, সুন্দর, শুদ্ধ, দ্বিভুজ,

নবীন জলদপ্রভ, পীত কৌশেয় বসন, নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলাম।

সাধক কমলাকান্ত বলিয়াছেন যথা—

"শুনহ কারণ করিতে সাধন এ বড় মরম কথা।
দুয়ারে সাপিনী (কুণ্ডলিনী) শুইয়ে আপনি পবন পুরিবে কোথা॥
ঘন ঘন তার পবন আহার মুখ খানি দুয়ারে দিয়ে।
সুমেরু গমন করিতে পবন পুনঃ এসে উলটিয়ে॥
পথ বিমোচন আছয়ে কারণ শুনহ তাহার ভাষা।
কহিব যেমন করিবে তেমন পুরিবে মনের আশা॥
প্রথম আসন কহিছি যেমন যতনে করিবে তায়।
বসি ধীরি ধীরি সরু করি করি পবন পুরিবে কায়॥
তিন কোণ খানি জ্বলিছে আগুনি তাহাতে পড়িবে ফু।
সহিতে না পারি পথ পরিহরি নাগিণী ছাড়িবে মু॥
সেপথে গমন করিতে পবন তাহাতে উঠিবে ধনী (কুণ্ডলিনী)।
তাহার মাঝারে ভাব আপনারে তবে সে সাধক জানি॥
পুনঃ সেই ধনী উঠিবে আপনি যেখানে হইবে লয়।
সেই সে পরম পদ অনুপম কেবল আনন্দময়॥
প্রথম সাধন করিল রচন শুনহ সাধকজন।
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত এই সে পরম ধন॥"

"ঘরের ভিতরে লইয়ে দুয়ারে কপাট দিয়ে
দ্বাদশ অঙ্গুলি ভোরে পেটে।
যদি পলাইতে চায়, (বায়ু) দড় করি ধর তায়,
ঠেলাঠেলি ক'রে লয়ে হেটে॥

রমণী (কুণ্ডলিনী)লইয়ে সাথে, ধায় পদ্মবন(সহস্রদলপদ্ম)পথে,
কুলের কপালে হয় কালি।
সাহসে করিয়ে ভর, প্রবেশে পরের ঘর,
(ব্রহ্মস্থান) ধর্ম্মাধর্ম্মে (বিধি নিষেধ) দিয়া জলাঞ্জলি॥
সঙ্গীগুলা (ইন্দ্রিয়গণ) খুঁজে মরে, কে তার উদ্দেশ করে,
কেবা তার (সাধকের) পায় পরিচয়॥
একেবারে সর্ব্বনাশ, একাকী করয়ে বাস,
দেখিয়া যমের লাগি ভয়।
সদা মত্ত (সাধক) মধুপানে (প্রেমফল) আপনারে শ্লাঘ্যমানে,
আত্মারাম বটে সেই প্রাণী।
কৌতুকে কমল কয়, শুনিয়ে না কর ভয়,
সেই জন সাধক চূড়ামণি॥"

উত্তরগীতায়াং প্রথমাধ্যায়ে; যথা—

"যোগামৃতরসং পীত্বা বায়ুভক্ষ্যঃ সদা সুখী।
যঃ সমভ্যস্যতে নিত্যং সমাধিং মৃত্যুনাশকৃৎ॥"

অর্থাৎ যিনি বায়ু মাত্র ভোজন করিয়া যোগরূপ অমৃতরস পান করতঃ সর্ব্বদা সুখী হওনার্থ প্রত্যহ সমাধি, অভ্যাস করেন, তিনি জন্মমরণাদিরূপ সংসারের বিনাশকারী হয়েন।

সকলেই অবগত আছেন যে ইংরাজী ১৮৩৭ সালে লাহোরে মহারাজ রণজিৎ সিংহের একটি বাগিচায় হরিদাস বাবাজী নামক জনৈক বৈষ্ণব ৪০ দিবস এবং ৪০ রাত্রি মৃত্তিকার নিম্নভাগে প্রোথিত থাকিয়া অনাহারে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাচ তাঁহার মৃত্যু হয় নাই তাহার কারণ কি? তাহার কারণ আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে

তিনি মহাপ্রভুর উপদেশ মত সহস্রদল কমল হইতে ক্ষরিত সুধা (প্রেমফল) পান করিয়া জীবিত ছিলেন। উপরি-উক্ত বৃত্তান্তটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

M. Gregor's History of the Sikhs. Page 228.

A novel scene occurred at one of the garden houses in February 1837. A fakir who arrived at Lahore, engaged to bury himself for any length of time, shut up in a box, without either food or drink : Runjeet disbelieved his assertions, and was determined to put them to proof ; for this purpose the man was shut up in a wooden box, which was placed in a small apartment below the level of the ground ; there was a folding door to the box, which was secured by lock and key. Surrounding this apartment, there was the garden house, the door of which was likewise locked ; and outside of this a high wall, having the door way builtup with bricks and mud. Outside the whole there was placed a line of sentries, so that no one could approach the building. The strictest watch was kept, for the space of forty days and forty nights : at the expiration of this period the Maharajah attended by his grand son and several of his Sirdars, as well as General Ventura, captain Wade and myself, preceeded to disinter the Fakir. The bricks and mud were quickly removed from the door way of the outer wall ; the door of the house was next unlocked and lastly that of the box containing the Fakir ;

the latter was found covered with a white sheet, on removing which, the figure of the man presented itself in a sitting posture. His hands and arms were pressed to his sides; and the legs and thighs crossed. The first part of the operation of resuscitation consisted in pouring over his head a quantity of warm water; after this, a hot cake of atta was placed on the crown of his head: a plug was next removed from one of his nostrils, on this being done, the man breathed strongly through it. The mouth was now opened, and the tongue, which had been closely applied to the roof of his mouth, brought forward, and both it and the lips anointed with ghee or melted butter; during this part of the process, I could not feel the pulsation of the wrist, though the temperature of the body was much above the natural standard of health. The legs and arms being extended and the eyelids raised, the former were well rubbed and a little ghee was applied to the latter. The eye balls presented a dim, suffused appearance like those of a corpse. The man now evinced signs of returning animation, the pulse was felt, while the unnatural temperature of the body quickly decreased. He made several ineffectual efforts to speak, and at length uttered a few words, but in a tone so low to make them inaudible. By and by his speech was re-established, and he recognised the by standers addressing himself to the Maharajah who was seated

opposite to him, watching all his movements. When the fakir was able to converse, the completion of the feat was announced by the discharge of guns, and other domonstrations of joy."

তাই তন্ত্র শাস্ত্রে বলিয়াছেন, যথা ;—

"সোমধারা ক্ষরেদ্‌যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ ॥"

অর্থাৎ হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত যে অমৃত, তৎপানে যে ব্যক্তি আনন্দময় হয়, সেই ব্যক্তি মদ্যসাধক হয়েন. ' এই শ্লোকের অর্থ না বুঝিয়া যাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রের দোহাই দিয়া মদ্যপান করেন, তাঁহারা অনন্তকাল নরকে বাস করেন, সন্দেহ নাই।

সাধারণ লোকে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, কিন্তু ভক্তি এবং জ্ঞান একই পদার্থ। পক্ষীর যেমন দুটী ডানা না থাকিলে কদাচ উড়িতে পারে না সেই রূপ ভক্তি এবং জ্ঞান উভয়ই না থাকিলে কদাচ জীবের মুক্তি হয় না। তাই ভগবান্ চৈতন্যদেব শ্রীরূপ এবং সনাতনকে জ্ঞানমার্গের উপদেশ দিয়া আবার ভক্তিমার্গে উপদেশ দিয়া দেখাইলেন যে, ভক্তি বিনা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয় না, এবং জীবের মুক্তি হয় না যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধ ভক্তি করিয়ে লক্ষণ ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন ॥

এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হইতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ হয় ॥”
“সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয় ॥
ভক্তি ভেদে রতি ভেদ পঞ্চ প্রকার।
শান্ত রতি দাস্য রতি সখ্য রতি আর ॥
বাৎস্য রতি মধুর রতি পঞ্চ বিভেদ।
রতি ভেদ কৃষ্ণ ভক্তি রস পঞ্চ ভেদ ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণ ভক্তি মধ্যে পঞ্চ প্রধান ॥
পঞ্চবিধ রস শান্তি দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার ভাবেতে প্রাবল্য ॥”

তাই তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন, যথা ;—

“মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং ॥
রৈকস্তসকুঙ্কুমাভাঃ কুন্তমধ্যে ব্যবস্থিতং।
মকারো বিন্দুরূপশ্চ মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে ॥
অকারোজসমারুহ্য একদা চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং ॥
আত্মনিরমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে।
ব্রহ্মাণ্ডং জায়তে যস্মাৎ তদ্ব্রহ্ম পরিকীর্ত্তিতং ॥
অতএব রামনাম তারকং ব্রহ্মনিশ্চিতং।
মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ং ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়োভবেৎ।
ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং॥
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং।
সর্ব্বপূজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদং॥
ষড়ঙ্গং পূজয়েদ্দেবি সর্ব্বমন্ত্রং প্রসীদতি।
আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমীরিতং।
আবাহনং শীতকারং নৈবেদ্যমনুলেপনং॥
জপনং বসনং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণা।
সর্ব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং প্রাণাধিকমিব প্রিয়ে॥"

চৈতন্যচরিতামৃতে—

"এই ভক্তি রসের করিল দিক্ দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় রতি সিন্ধু পারে॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৯ম অধ্যায়।

"মন্মনাভবমদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎ-পরায়ণঃ॥"

অর্থাৎ তুমি মদ্‌গতচিত্ত, মদ্ভক্ত ও আমার পূজাপরায়ণ হও এবং আমাকে নমস্কার কর; এইরূপে আমার শরণাগত হইয়া তোমার নিজ অন্তঃকরণ সমর্পণ করতঃ আমাকে প্রাপ্ত হও। অর্থাৎ নদী যেমন নিজ নামরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে মিশাইয়া সমুদ্রাকারাকারিত হইয়া যায়, সেই রূপ ভক্তও ভক্তির প্রবলবেগে নাম রূপ বর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বয়ং জ্যোতিঃ পরমাত্মা পুরুষে অভিন্ন রূপে মিশিয়া যান।

চৈতন্যচরিতামৃতে যথা ;—

"উদ্‌ঘূর্ণা বিরহ চেষ্টাদিব্যোন্মাদি নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান ॥"

তাই মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, যথা ;—

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"

অর্থাৎ যেমন তেলাপোকা কাচপোকা কর্ত্তৃক ধৃত হইলে, কাচপোকাকে চিন্তা করিয়া, স্বয়ং কাচপোকা হইয়া যায়, সেইরূপ ভক্তও ভগবৎ চিন্তায় তদ্ভাব প্রাপ্ত হয়েন। যথা ; শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতং নির্ব্বাণষট্‌কং।

"অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপঃ
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্নভীতি
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥"

অর্থাৎ আমি যে পদার্থ তাহা নিরাকার নির্ব্বিকল্প অথচ সর্ব্বব্যাপী ও সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক, সুতরাং আমার বন্ধন মুক্তি বা ভয়াদি নাই যেহেতু সেই চিদানন্দ স্বরূপ যে শিব সেই শিবরূপই আমি হই।

মহাপ্রভু এই সকল সূক্ষ্মতম গুহ্য তত্ত্ব শ্রীরূপ এবং সনাতনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই সকল তত্ত্ব গুরুমূলক বলিয়া আমরা পাঠককে বিশদরূপে বুঝাইতে পারিলাম না, কেন না তন্ত্রশাস্ত্র বলিতেছেন যথা,—

"যস্য কস্য ন দাতব্যং ব্রহ্মজ্ঞানং সুগোপিতং।
যস্য কস্যাপি ভক্তস্য সদ্‌গুরুস্তস্যদীয়তে ॥"

অর্থাৎ সুগোপিত ব্রহ্মজ্ঞান যে কোন ব্যক্তি দান করি-

যেন না কিন্তু, সদ্‌গুরু কেবল ভক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।

আজকাল পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানী ব্যক্তিগণ তর্ক স্থলে বিতণ্ডা করিয়া থাকেন যে ধর্ম্মতত্ত্ব গোপন করিবার আবশ্যকতা কি? হিন্দুশাস্ত্রের এই একটি প্রধান দোষ বলিয়া তাঁহারা ঘোষণা করিয়া থাকেন কিন্তু আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিয়া পাঠককে বুঝাইব। বাজারে মনোহারী দ্রব্যের দোকান যেমন খোলা আছে সেইরূপ জহরাতের দোকানও খোলা আছে। দুইটি দোকানে যাইতে কাহারও পক্ষে নিষেধ নাই যিনি ইচ্ছা করেন যাইতে পারেন, কিন্তু মনোহারী দ্রব্যের দোকানে এত ক্রেতা কেন? এবং জহরতের দোকানে খরিদার নাই কেন? জহরী একাকী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আছে কেন? ইহার কারণ এই যে যাহারা দরিদ্র তাহারাই মনোহারী দ্রব্যের দোকানে গিল্‌টি করা জিনিস্ অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া আনন্দ লাভ করে। জগতে অর্থহীন ব্যক্তির সংখ্যা অধিক তাই মনোহারী দোকানে খরিদার বেশী। যিনি অর্থবান্ তিনি কখনই উক্ত দোকানে যাইবেন না এবং গিল্‌টি করা জিনিস্ কখনই স্পর্শ করিবেন না। তিনি জহরতের দোকানে গিয়া বহুমূল্য প্রদান করিয়া হীরকখণ্ড ক্রয় করিবেন, ইহা অর্থহীনের পক্ষে বড়ই সুদুর্লভ। অর্থবান্ লোকের সংখ্যা বড়ই অল্প তাই জহরীর দোকানে খরিদারের সংখ্যাও কম। সেইরূপ ধর্ম্মহীন মানুষের মন অসদ্‌বস্তুর দিকে সর্ব্বদাই ছুটিতেছে, সদ্‌বস্তুর চিন্তা তাহাদের নাই। ভারতে সদ্‌গুরুর অভাব কি? সদ্‌গুরু মানবকে

উপদেশ দিবার জন্য জহরীর ন্যায় নির্জ্জন স্থানে দোকান খুলিয়া শিষ্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু দরিদ্র (ধর্ম্মহীন) কলির জীবের পুঁজি নাই অর্থাৎ শ্রদ্ধা নাই, ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, আগ্রহ নাই এ জন্যই তাঁহার নিকটে কেহ যাইতে পারে না। আজকাল একটা হৈ হৈ রব শুনিতে পাওয়া যায় যে, যথা শাস্ত্র গুরু পাওয়া যায় না ইহাতে বোধ হয় যে যথাশাস্ত্র শিষ্যের আর অভাব নাই কিন্তু আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না গুরু দুর্ল্ভ কি শিষ্য দুর্লভ? শতাবধি গুরুর মধ্যে একটি গুরু আজও দুর্ল্ভ নহেন, কিন্তু সহস্র সহস্র শিষ্যের মধ্যে একটিও কি যথাশাস্ত্র শিষ্য পাওয়া যায়? জগতে যেখানে যাহা যেমন প্রয়োজন বিশ্বনাথ সৃষ্টির পূর্ব্বেই তাহা ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সন্তান ভূমিষ্ট হইয়া কি আহার করিবে যিনি এই চিন্তায় মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যে ধর্ম্ম প্রাণ শিষ্যের জন্য সদ্‌গুরু সৃষ্টি করেন নাই ইহা বড়ই অসম্ভব।

আমরা অর্থ লালসায় যেরূপ ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করি, সেইরূপ যদি সদ্‌গুরুর চরণ দর্শন জন্য ক্ষণকাল মাত্রও ব্যাকুল হইতে পারি তবে আর সদ্‌গুরু পাইবার ভাবনা কি? ধিক্ তাহার জীবন যিনি সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

রুদ্র যামলে—

"ধিগধনং ধিগ্‌বলং তেষাং ধিক্‌কুলং ধিগ্ বিচেষ্টিতং।
যেষাং নোৎপদ্যতে ভক্তির্গুরুদেবে মহেশ্বরি॥"

মহেশ্বরি ! ধিক্ তাহাদের ধনে, ধিক্ তাহাদের বলে, ধিক্ তাহাদের কুলে, ধিক্ তাহাদের কর্ম্মকাণ্ডে, গুরুদেবের প্রতি যাহাদের ভক্তি উদয় না হয়।

বাউলের স্থর—(দরবেশীর গীত)

কথায় কথায় দিন্ গেল মন
ও তুই ভবের বাজর কর্‌বি কথন বল্‌না মোরে।
ওরে থাকিস্‌রে মন কুপ্রসঙ্গে দিন কাটালি নানারঙ্গে,
বাজারের আখির হ'লে আরকি মেলে
মরবি আনাগোনা করে ॥
ওরে কিন্‌তে হবে খাঁটি সোনা, তল হাটের গোলে যেওনা,
দিয়ে তোরে গিল্টি করা মনোহরা,
পুঁজিপাটালবে কেড়ে।
ওরে কাঙ্গাল বলে একীন্ ক'রে,
ধর্‌গে সোনার মহাজনে,
যার আছে সোনা জানা শোনা,
দেবে পারের উপায় করে ॥

সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও সাধন তত্ত্ব জানিবার উপায় নাই ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, যথা—

"মন্থিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারাস্ত যোগিভিঃ পীতাস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥"

অর্থাৎ চারিবেদ ও সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া যোগিগণ তাহার নবনীত স্বরূপ সারভাগ পান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অসারভাগ যে তক্র (ঘোল) ইহাই পণ্ডিতগণ পান করিয়াছেন।

পিচ্ছিলাতন্ত্র—

"গুরুমূলমিদং শাস্ত্রং নান্যঃ শিবতমঃ প্রভুঃ।
অতএব মহেশানি! যত্নতো গুরুমাশ্রয়েৎ ॥

এই সাধন শাস্ত্র কেবল গুরুমূলক, ইহাতে গুরু ভিন্ন অন্য কেহ কল্যাণকর প্রভু নহেন। মহেশ্বরি। অতএব সাধক যত্নপূর্ব্বক গুরুকে আশ্রয় করিবেন।

এইখানে আমাদের একটি গল্প মনে হইল, কোন সময়ে এক নগরে একটি সাধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, নগরের রাজা সাধু আগমনের বার্ত্তা অবগত হইয়া সাধুর নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! যদি ভাগ্যক্রমে আমার রাজ্যে শুভাগমন করিয়াছেন তবে কৃপা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান আমাকে বুঝাইয়া দিউন। সাধু বলিলেন অবশ্য আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিব কিন্তু তুমি অগ্রে জহরাতপরীক্ষা শিক্ষা করিয়া আইস, জহরাত পরীক্ষা না শিখিলে ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ তাহা বুঝিতে পারিবে না। রাজা কহিল এতো অতি সহজ ব্যাপার আমার রাজ্যে বহুতর জহরী আছে, আমি অবিলম্বে শিক্ষা করিব। রাজা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া রাজভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, জহরীদিগকে তাঁহার নিকটে আসিতে ঘোষণা করিলেন, এই সংবাদ পাইবামাত্র নগরের সমস্ত জহরী রাজসমীপে উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাদিগকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে আমাকে জহরতপরীক্ষা শিক্ষা করাইয়া দাও নচেৎ তোমাদিগের গুরুতর দণ্ড করিব। জহরীগণ ভীত হইয়া বলিল, রাজন্!

আমাদের নিকট এমন বিদ্যা বা মন্ত্র নাই যে আমরা আপনাকে শীঘ্র জহর-পরীক্ষা শিখাইতে পারি, আমাদের সঙ্গে এবং আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে আপনাকে বহুদিন থাকিতে হইবে, এবং দেখিয়া শুনিয়া ক্রমশঃ শিক্ষা করিতে পারিবেন নচেৎ উপায়ান্তর নাই। রাজা বড়ই দুঃখিত হইয়া সাধুর নিকটে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া সাধুকে কহিলেন যে জহরাত পরীক্ষা শিক্ষা করিতে হইলে বহুকাল জহরীদিগের নিকটে থাকিতে হইবে, নচেৎ উপায় নাই, তখন সাধু হাস্য করিয়া কহিলেন যে এই সামান্য অকিঞ্চিৎ-কর-পদার্থ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে যদি বহুদিন জহরীর সঙ্গে থাকিতে হয়, তবে ব্রহ্ম বিষয় জানিতে হইলে বহু-কাল সাধু অর্থাৎ গুরুর শুশ্রূষা করিতে হইবে এবং তীব্র সাধন করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ না করিলে ("তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈক ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্। ধর্ম্মস্যতত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।") সাধন শাস্ত্রের কখন উপলব্ধি হইতে পারে না। তখন রাজা লজ্জিত হইয়া রাজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। আজ কাল সাধুসঙ্গ না করিয়া, গুরু উপদেশ গ্রহণ না করিয়া এবং সাধন না করিয়াই সকলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, আবার অনেকেই বলিয়া থাকেন যে অগ্রে ধর্ম্মতত্ত্ব জানিব তৎপরে সাধন করিব, কি আশ্চর্য্য! ইহারা অগ্রেই সন্তরণ শিক্ষা করিয়া তৎপরে জলে নামিতে চাহেন। এই স্থলে আমরা আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। কোন সময়ে এক সাধু দুইটি ব্যক্তির হস্তে দুইটি ক্ষুদ্র বট-বীজ দিয়া

বলিয়াছিলেন যে এই দুইটি বীজের মধ্যে দুইটি বটবৃক্ষ সূক্ষ্মভাবে নিহিত আছে, যদি তোমরা তাহা দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বীজ দুইটি মৃত্তিকায় রোপণ কর এবং জলসেচন করিয়া যত্ন কর, ক্রমশঃ দেখিতে পাইবে ইহার মধ্যে বাস্তবিক দুইটি বৃক্ষ আছে। যাঁহার সাধুর বাক্যে বিশ্বাস হইল তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন অর্থাৎ বীজটিকে মৃত্তিকায় রোপণ করিয়া জলসেচন এবং রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে লাগিলেন, অল্পদিন মধ্যেই ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ একটি বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইল, তখন তিনি বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন। আবার যিনি সাধুবাক্যে বিশ্বাস করিলেন না তিনি ভাবিলেন এই ক্ষুদ্রতম বীজের মধ্যে বৃহৎ বৃক্ষ কখনই থাকিতে পারে না, এবং এবং যদি থাকে তাহা হইলে ইহার কারণ কি তিনি তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং বীজটি মৃত্তিকাতে রোপণ করিলেন না, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার জীবন কাটিয়া গেল, তাহার হস্তের বীজ হস্তেই রহিয়া গেল, বীজের মধ্যে বৃহৎ বৃক্ষ তিনি কখন দেখিতে পাইলেন না। ধর্ম্মতত্ত্বও ঠিক সেই রূপ, গুরু হরিনাম গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন কিন্তু উপযুক্ত শিষ্য ভাবিলেন হরিনাম করিয়া কি হইবে? হরিনাম করিলে কি হইবে অগ্রে তাহা বুঝিব তবে নাম গ্রহণ করিব। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি হরিনাম করিলে কি হইবে কে তোমাকে বুঝাইয়া দিবে? পাচক অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক করিলেন, কিন্তু যিনি ভোজন করিবেন তিনি কিরূপ আস্বাদন অনুভব করিবেন,

পাচক কখন বুঝাইতে পারেন না। আবার ভোজন করিয়া কিরূপ আস্বাদন অনুভব করা যায়, কেহ কি কাহা-কেও বুঝাইতে পারেন? তাহা কখনই হইতে পারে না, যিনি ভোজন করিলেন তিনিই বুঝিলেন। সেইরূপ হরি-নামের মধ্যে কি সুধা নিহিত আছে কে তোমাকে বুঝাইয়া দিবে। তুমি গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া হরিনাম গ্রহণ করিতে থাক, হরিনাম কবিতে করিতে অবশ্যই একদিন সুধা অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইবে, তখন তুমি সদ্‌গুরুর জন্য ব্যাকুল হইবে, তোমার তীব্র আকর্ষণে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তোমাকে সাধনমার্গে উপদেশ দিবেন, তখন "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এরূপ স্থির করিয়া উগ্র সাধন করিতে থাকিবে, সাধন করিলে কি হইবে তখন তুমি নিজেই বুঝিবে, এবং আপনার দেহের মধ্যেই ভগ-বানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। ভক্ত চূড়ামণি তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"সবহি ঘট্‌মে হরি বৈঠে যৈসে গিরিস্থতমে জ্যোতিঃ।
জ্ঞান গুরু চক মথ্ বিনা কৈ সে প্রকট হোতি॥"

অর্থাৎ যেমন প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে অগ্নি নিহিত আছে সেইরূপ সর্ব্বদেহ মধ্যে হরি (বামন) বিরাজ করিতেছেন। আবার যেরূপ চকমকির আঘাত প্রাপ্ত না হইলে প্রস্তরখণ্ড হইতে অগ্নি কখন প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ সদ্‌গুরুর উপ-দেশ প্রাপ্ত না হইলে দেহস্থ পুরুষের (ভগবানের) সাক্ষাৎ-কার হয় না। আবার উগ্র সাধন বলে যখন তুমি কুণ্ড-লিনীকে (লক্ষ্মী) সহস্রদল পদ্মে উঠাইতে পারিবে তখন

তুমি যোগামৃত রস (প্রেম ফল) সেবন করিয়া অতুল আনন্দ ভোগ করিবে এবং তখন "কৃষ্ণ স্ফূরণ" হইবে এবং "আপনাতেই কৃষ্ণজ্ঞান" অনুভব করিবে, তখন চিরদিনের মত অমৃত সাগরে ডুবিয়া যাইবে, আর উঠিবে না সুতরাং—সাধক! তোমার সাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসার তখন আর আবশ্যকতা থাকিবে না। ইহাই গুরু চৈতন্যদেবের লীলার প্রধান অর্থাৎ পারত্রিক সুখ সম্বন্ধে গুহ্য রহস্য।

উপসংহার কালে আমরা আরও দুই একটি কথা বলিয়া পাঠকের নিকট বিদায় লইব। যে দিন হইতে ভারতবর্ষ পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই বর্ণ এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছে। পদে পদে বিপত্তি, দুরবস্থা ও হীনতা ইহার চিরগৌরব বিনাশ করিয়াছে। আর্য্যজাতির পরাক্রম নাই (আর কখন হইবেও না) শিল্প-নৈপুণ্য নাই, জ্ঞান বিজ্ঞান শাস্ত্রোলোচনা নাই, অর্থ নাই. ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি কিছুই নাই। তাই দাসত্ব লব্ধ অন্ন ব্যতীত হিন্দুর জীবন ধারণের উপায় নাই। চাকৃরি করিতে হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কখনই পালন করা যাইতে পারে না। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া অবধি রাত্রিকাল পর্য্যন্ত হিন্দুকে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, চাকৃরি করিতে হইলে তাহার একটিও নিয়ম পালন করা যাইতে পারে না, (আজ পর্য্যন্ত কেহ পালন করিতেও পারেন নাই) এবং চাকৃরি করিতে হইলে সর্ব্বদাই মনোগ্লানি হইয়া থাকে, তাই মনোমধ্যে ধর্ম্ম-চিন্তা স্থান পায় না। আবার চাকৃরি করিতে হইলে ইংরাজি ভাষা অধ্যয়ন করিতেই হইবে,

ইংরাজি ভাষা অধ্যয়ন করিতে হইলে বাল্যকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বর্ণধর্ম্ম পালন করিবার অবকাশ থাকে না সুতরাং হিন্দুর একুল ওকুল দুকুল যাইতেছে বরং হিন্দু আজ ধর্ম্মহীন হইয়া উঠিয়াছেন। এ দিকে নিষ্ঠাবান্ পুরোহিত ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা গুরু এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিলে পাপাচরণ হয় তাহা আমরা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি সুতরাং এই বর্ণশঙ্কর বিপ্লব দেশে স্বেচ্ছাচার, ম্লেচ্ছাচার, কদাচার, পাপাচারসঙ্কুল কলিকালে বর্ণধর্ম্ম পালন করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

তাই স্বয়ং, নারদ বলিয়াছেন যে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। ইতি ষোড়ষকং নাম কলিকলুষনাশনং। নাতিপরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥ তথা হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ইতি বারত্রয়মভিহিতং। অতঃ কলিযুগধর্ম্ম হরের্নামৈব কেবলম্" অর্থাৎ কলিযুগে হরিনাম গ্রহণ ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করা নিষেধ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন যথা—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

অস্যার্থঃ।—তুমি সমুদয় ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত করিব।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্ব ধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণধর্ম্ম, আশ্রম-

ধর্ম্ম ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র ঈশ্বরের শরণাগত হইতে পারিলে, তিনি সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট করিয়া দেন, কেননা সকল ধর্ম্মেরই অধিষ্ঠাতা ভগবান্। ঈশ্বরের শরণাগতি লাভ করিতে হইলে "ঈশ্বরের আমি" "ঈশ্বর আমার" এবং "ঈশ্বরই আমি" এইরূপ ত্রিবিধ শরণাগতি শাস্ত্রে ব্যবস্থা করিয়াছেন যথা—

প্রথম শরণাগতি—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচনো সমুদ্র স্তারঙ্গঃ॥"

হে অখিলনাথ! যদিচ সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ নাই সত্য, তথাপি লোকে সমুদ্রেরই তরঙ্গ বলে, কেহ তরঙ্গের সমুদ্র বলে না; সেইরূপ হে নাথ! তোমাতে আমাতে কোন ভেদ না থাকিলেও "আমি তোমারই" কিন্তু "তুমি আমার" একথা বলিতে পারি না।

দ্বিতীয় শরণাগতি, যথা—

"হস্তমুৎ ক্ষিপ্য যাতোহসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতং।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামিতে॥"

একদা গোপিকাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলে পর, যখন তিনি হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করেন, সেই সময় গোপিকাগণ ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যে আমাদের হাত ছাড়াইয়া বলপূর্ব্বক পলায়ন করিলে ইহাতে তোমার পৌরুষ কি? আমাদের হৃদয় ছাড়িয়া যদি পলাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝিতে পারি। এখানে ভক্ত "ভগবান্ আমার এই" পরিচয় দিয়াছেন।

তৃতীয় শরণাগতি, যথা—

"সকল মিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ পরমঃ পুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবতানন্তে হৃদয়গতে ব্রজতান্ বিহায় দূরাৎ॥"

"স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ এবং আমি বাসুদেব স্বরূপ, সেই পরম পুরুষ অদ্বিতীয়" এইরূপ স্থির নিশ্চয় ভাব যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিদ্যমান, হে দূত! ঈদৃশ ব্রহ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে তুমি কদাচ গমন করিও না। ঈদৃশ তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিকে তুমি দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও (দূতের প্রতি যমের উক্তি)।—ভগবান্ প্রথমে কর্ম্ম-নিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠা, পরস্পর সাধ্য সাধন-ভাবে বিস্তার পূর্ব্বক বলিযাছেন তাই মহাপ্রভু প্রথমে অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে বলিয়াছেন। যথা—

"কলিকালে নামরূপ কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
হরিশব্দে নানা অর্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন॥
যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ॥"

আদি পুরাণে যথা—

"হরিনাম রতা যে চ হরিকীর্ত্তন তৎপরাঃ।
হরিপূজা রতা যে চ তে কৃতার্থাঃ কলৌ যুগে॥"

তৎপরে মহাপ্রভু শ্রীরূপকে জ্ঞান নিষ্ঠার উপদেশ দিলেন অর্থাৎ "ভক্তিলতা বীজ ইত্যাদি" এবং অবশেষে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে "বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান'

অর্থাৎ উপরিউক্ত তৃতীয় শরণাগতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু ভারতের ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গল বিধান জন্য সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা পাঠককে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি। সনাতন বা শাশ্বতধর্ম্ম উদ্দীপনার্থই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। অতএব স্বদেশহিতৈষী এবং ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রেই এই পবিত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ক্রমশঃ ভারতে অর্থাগম এবং প্রকৃত ধর্ম্মালোচনা হইবে। অন্নাভাব, কদাচার, পাপাচার সমস্ত দুঃখ ভারত হইতে বিদূরিত হইবে ইহাই মহাপ্রভুর লীলার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সম্পূর্ণ।

